যুদ্ধাপরাধীর খোঁজে নয় মাস

তাজুল মোহাম্মদ

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১২

স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ মাসুক হেলাল

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ❑ পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম ❑ একশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN 978 984 90075 2 4

Juddhaparadir Khuja Noy Mas by Tazul Mohammad
Published by : Monirul Hoque, Ananya 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2012, Cover Design : Mashuk Helal
Price : 150.00 Take Only.

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22, Brick Lane, London

U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202

Canada Distributor ❑ **ATN Mega Store**
2976 Danforth Ave. Toronto

উৎসর্গ

জাতীয় চার নেতা
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
তাজউদ্দিন আহমদ
এম. মনসুর আলী এবং
এ. এইচ. কামরুজ্জামান
মুক্তিযুদ্ধে যারা দিয়েছেন নেতৃত্ব

অবতরণিকা

নয় মাস কিংবা নয় বছর নয়। খোঁজা-খুঁজি শুরু করেছি ১৯৮০ সালে। চালিয়ে যাচ্ছি এখনো। সহসা তা বন্ধ করার ইচ্ছেও নেই। তা হলে এমন নামটি কেন? 'যুদ্ধাপরাধীর খোঁজে নয় মাস'–বললেতো-তা বুঝা যায় না।

হ্যাঁ, শুরু করার ১৪ বছর পরের কথা। ততদিন কাজ করেছি একটি অঞ্চল ধরে। এর মধ্যে যোগাযোগ করে ব্রিটেনের একটি টেলিভিশন কোম্পানি টুয়েন্টি টুয়েন্টি। যুদ্ধাপরাধী নিয়ে কিছু গবেষণা কাজ করতে চান তারা। কিন্তু সব যুদ্ধাপরাধী নয়–নির্দিষ্ট কয়েকজন। ওরা সবই বাস করছে ব্রিটেনে। সে দেশের নাগরিকত্বও রয়েছে তাদের। বিভিন্ন ব্যানারে কাজ করছে ওরা জামায়াতের হয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত গভীরভাবে।

বাংলাদেশে জামায়েতে ইসলামির সঙ্গে সেই যুদ্ধাপরাধীদের রয়েছে আগের মতোই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেখান থেকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে জামায়াতকে। মৌলবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটাচ্ছে সমস্ত যুক্তরাজ্য জুড়ে। যা ক্ষতিকর-ছিল উভয় দেশের জন্যে। ওরা সবাই ছিল জামায়াতে ইসলামি কিংবা এর অঙ্গ সংগঠন ছাত্রসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা। মুক্তিযুদ্ধকালে শান্তি কমিটি বা আল বদর বাহিনী গঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল এবং বদর বাহিনী পরিচালনা, এর পরিকল্পনা প্রণয়ন, ও বাস্তবায়ন করেছে। বুদ্ধিজীবী হত্যা, সাধারণ মানুষ খুন, গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি বহু অপরাধের অভিযোগ রয়েছে–ওদের বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ওদের কেউ কেউ গ্রেপ্তারও হয়েছিল। মামলা দায়ের হয় ওদের বিরুদ্ধে। বিচারকার্যও শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে জামিনে মুক্ত হয়ে পাঁড়ি জমিয়েছে কেউ কেউ ব্রিটেনে। আবার, কোনো কোনো জামায়াত নেতা গ্রেফতার হবার আগেই দেশের বাইরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। একত্রিত হয়েছে তারা ব্রিটেনে। শুরু করেছে সেখানে বাংলাদেশের বিরোধী তৎপরতা। চালিয়ে যাচ্ছে তা নানাভাবে।

টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশন এই যুদ্ধাপরাধীদের কয়েকজনকে সনাক্ত করে এদের যুদ্ধাপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের উপর গবেষণা করার একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়। আর এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেন ডেভিড বার্গম্যান। তালিকাভুক্তদের একজনের জন্মস্থান ছিল ফেণীতে। একাত্তরে কর্মস্থল ঢাকায়। 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকায় কর্মরত চৌধুরী

মঈনুদ্দিন ছিল ঢাকায় আল-বদর বাহিনীর অপারেশন ইন-চার্জ। বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছে সে। অন্যদের সবার বাড়িই সিলেট অঞ্চলে। ডেভিড আসলেন বাংলাদেশে। পরিকল্পনা অনুযায়ী চৌধুরী মঈনুদ্দিন ব্যতীত অন্য সবার দায়িত্ব পড়ে আমার উপর–একাই। ১৯৯৪ সালের ১১ আগস্ট থেকে শুরু করি এই কাজ। একটু ভিন্নতা ছিল–এ কাজে। ১৪ বছর ধরে কাজ করেছি পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী এবং তাদের সহযোগিদের অপরাধকর্ম সংগ্রহে। সেখানে জামায়াত, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জি.ডি.পি প্রভৃতি স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোর নেতাদের সবার ব্যাপারেই তথ্য সংগ্রহ করেছি। গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী হত্যা, নারী নির্যাতন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি যেখানে–যে ঘটনার সঙ্গে যে যুদ্ধাপরাধীর নাম পাওয়া গেছে তাকে নিয়েই গবেষণা করেছি। আর, একাজে ঐ নির্দিষ্ট লোকগুলোকে নিয়েই গবেষণা। সব মিলিয়ে কাজটি শেষ করতে লেগেছিল নয় মাস সময়।

দীর্ঘ গবেষণা শেষে তিনজন মাত্র যুদ্ধাপরাধীর কর্মকাণ্ড নিয়ে নির্মিত হয় প্রামাণ্য চিত্র 'দ্যা ওয়্যারক্রাইমস্ ফাইল।' এই নয় মাসের গবেষণায় যেসব তথ্য উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে তার সব কিছুই দেখানো হয়নি প্রামাণ্যচিত্রে। তা হয়তো সম্ভবও হতো না। যা প্রদর্শিত হয়েছে তার পেছনেও ছিল বহু ইতিহাস-বহু ঘটনা। ঘটনার পেছনের ঘটনা–এর ব্যাখ্যা সবকিছুই বলা হয়নি। অনেক কিছু হয়তো–এখনো প্রকাশ করা যাবে না। তবে, যা যা প্রকাশ করতে সমস্যা নেই–তা-ই শুধু তুলে ধরা হয়েছে।

'দ্যা ওয়্যারক্রাইমস্ ফাইলে' কাজ করেছেন আরো অনেকে। তাদের অনেকেরই কর্মকাণ্ড ছিল আমার অজান্তে–ঢাকায়। সে সব নয়–যা আমি করেছি, যে যে তথ্য উদ্ঘাটন করেছি, সেসব নিয়েই এ গ্রন্থ 'যুদ্ধাপরাধীদের খোঁজে নয় মাস।' আশা করি, নতুন প্রজন্ম জামায়াত এ আল-বদরদের নৃশংসতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভে সক্ষম হবে–এ গ্রন্থ পাঠে। আবার, সেই ঘাতক-যুদ্ধাপরাধীদের উত্তরসূরিদের তৎপরতার কিছু কিছু তথ্যও পাবে এ গ্রন্থে। গ্রন্থখানা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় অনন্যা'র মনিরুল হককে অশেষ ধন্যবাদ।

মন্ট্রিয়াল, কানাডা
ফেব্রুয়ারি ২০১২

তাজুল মোহাম্মদ

সূচিপত্র

গবেষণা শুরু : শুধাইলো না কেউ

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার গবেষণা, লেখা-লেখি ইত্যাদি শুরু করার প্রায় দেড় দশক পর যোগাযোগ করেন ডেভিড বার্গম্যান। ইংল্যান্ডের টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আসছেন তিনি বাংলাদেশে। গবেষণা চালাতে চান কয়েকজন নির্দিষ্ট যুদ্ধাপরাধীর উপর। এরা সবাই ছিল জামায়াত কিংবা ছাত্র শিবিরের নেতাকর্মী। একাত্তর সালে ঘাতক আল-বদর বাহিনীর নেতৃস্থানীয় কমান্ডার। স্বাধীনতার পর নানাভাবে চলে গেছে ব্রিটেনে। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের আড়ালে কাজ করছে জামায়াতের জন্যে। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের জন্যে খুবই ক্ষতিকর কর্মে জড়িত করা। সে কাজে যুক্ত করতে চান আমায়। আমিও রাজি হয়ে যাই সাথে সাথেই। তারপর ডেভিড বার্গম্যান আসেন সিলেট। ১৯৯৪ সালের ১১ আগস্ট তিনি বিমানের একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে সিলেট পৌঁছার পর থেকেই কাজে নামি আমরা। তারপর পুরো ৯ মাস গবেষণা চালিয়েছি আমি।

ডেভিড যেসব যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন তারা হলেন একাত্তরে সিলেট জেলা জামায়াতে ইসলামির সেক্রেটারি জেনারেল হাফেজ মৌলানা লুৎফর রহমান, সে সময়ে জেলা ছাত্র সংঘের নেতা এবং আমি বদর কমান্ডার মাওলানা আবু সায়ীদ, মাওলানা আব্দুস সালাম এবং গৌছুর রহমান চৌধুরী। এরা সবাই সিলেট জেলার বাসিন্দা এবং বসবাস করছেন ব্রিটেনে। এ ছাড়াও আছেন ফেণীর লোক ঢাকায় আল বদর বাহিনীর অপারেশন-ইন-চার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিন। তিনিও বাস করছেন সেদেশে। প্রাথমিক আলোচনার মাধ্যমেই একটি পরিকল্পনা তৈরি করি। তারপর নেমে পড়ি কাজে। প্রথম দিনই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি শামসুল আলম চৌধুরী, সাইদুর রহমান খান মাহতাব, ছাদ-উদ্দিন, নূরুল ইসলাম, আশফাক আহমদ, এনামুল হক চৌধুরী। ও আব্দুল হামিদের। প্রাথমিক কথাবার্তার পর একটি তালিকা তৈরি করতে থাকি। সে হিসেবে পরের দিন আব্দুল মালেকের (আওয়ামী লীগ নেতা, আইনজীবী) সঙ্গে দেখা করি। একটি অতি সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়ে দেন তিনি। একইভাবে আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিতে গেলে কানাইঘাটের একটি বিশ্বস্ত সোর্স হিসেবে একই লোকের সন্ধান দেন। ঠিকানাও দেন আমাকে। তারপর সাংবাদিক মহিউদ্দিন আহমদ শীরু (মরহুম) লেখক, রফিকুর রহমান লজু, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান এডভোকেট আ. ফ.ম. কামাল, এডভোকেট

তবারক হোসেইন প্রমুখ সবাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। মুক্তিযোদ্ধা সেলিম আহমদ (নুরজাহান হাসপাতালের চেয়ারম্যান) নিয়ে যান মুক্তিযোদ্ধা এনাম আহমদের বাসায়। গ্রহণ করি তার সাক্ষাৎকার। পরে গুলজার আহমদের বাসায়ও নিয়ে যান নিজের গাড়ি দিয়ে। এডভোকেট শাহ মোদাব্বির আলী মানিকের সাথেও সাক্ষাৎ করি ফেরার পরে। এবারে লাঞ্চ সারতে হবে। আগেই দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন সেলিম আহমদ। লাঞ্চ সমাপ্ত করেই ছুটি নয়া সড়ক হাফিজিয়া মাদ্রাসায়। সে মাদ্রাসার অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার নিতে চাই। কিন্তু মাদ্রাসায় নেই তিনি। গিয়েছেন নয়া সড়ক মসজিদে। তা হলে কি বসে বসে অপেক্ষা করবো? না, তা করিনি আমরা। ঐ সময়টা কাজে লাগানোর জন্যে গিয়েছিলাম আব্দুল কাইয়ুমের বাসায়। কিন্তু কোনো তথ্য দেননি তিনি। আর, আওলাদ হোসেন তো দেখাই করেননি। অথচ এরা দু'জনই অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে অন্যরা জানিয়েছেন আমাদেরকে। হয়তো নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কিংবা অন্য কোনো কারণে মুখ খুলতে চাননি তারা।

আবার হাফিজিয়া মাদ্রাসা। এবারে পাওয়া গেল অধ্যক্ষকে। সম্ভবত উনার নাম ছিল নূরুল ইসলাম। হাফিজ লুৎফর রহমান, আবু সায়ীদ, শামসুল হক, আব্দুস সালামসহ জামায়াত নেতাদের বহু কুকর্মের কথা জানেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে এদের ভূমিকা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিলেন। তাছাড়া আরো অধিক জানার জন্যে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক জিল্লুর রহমানের শরণাপন্ন হতে উপদেশ দেন। কাল বিলম্ব না করেই ছুটি–আলিয়া মাদ্রাসায়। পেয়েও গেলাম তাকে। দীর্ঘ সময় ধরে কথাও হলো। আমরা এখন বেশ ক্লান্ত। ফিরে গেলাম হোটেলে। ব্রেক নিলাম ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের। তারপর নতুন করে আবার সাক্ষাৎকার নিতে বেরুই। এবারে প্রথমেই বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সাবেক পি.সি. এডভোকেট মনির উদ্দিন আহমদ। তাকেও পাওয়া যায়নি। ফেরার পথে মখলিছুর রহমান নামক একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করি। এভাবে দিনে আমাদের প্রাথমিক আলাপ হয়েছে প্রায় কুড়িজনের সঙ্গে। কিন্তু এর পর কি করবো? রাত সাড়ে ১০ টায় ফিরি বাসায়। নৈশ ভোজ এবং পরের দিনের কাজের পরিকল্পনা চললো এক সাথে। এভাবেই কাটাই আমরা মধ্যরাত পর্যন্ত।

১৩ আগস্ট। ভোর ৫টাই শয্যা ত্যাগ করি। শুরু হলো প্রস্তুতি। সোজা চলে যাই কানাইঘাট। যাতায়াতের জন্যে সেলিম আহমদই একটি গাড়ি ঠিক করে দেন। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে যাই ডা. ফয়জুল হকের ফার্মেসি। কানাইঘাট থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি তিনি। হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানান আমাদেরকে। জানালাম আমাদের উদ্দেশ্য। ডা. ফয়জুল হক নিজেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিগৃহীত। অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিলেন। উড়ে গিয়েছিল কয়েকটি দাঁত। আর, দন্তবিহীন চোয়াল সেদিনও পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী এবং বাংলার বেজন্মাদের নৃশংস স্বাক্ষ্য বহন করছিল। আওয়ামী লীগের থানা শাখার সভাপতি। তার চেয়েও বড় কথা–একাত্তরকে ভুলেননি তিনি। ক্ষমা করতে পারেননি পাকিস্তানি

হানাদার সৈন্যবাহিনীর পা-চাটা দালালদের। জামায়াতের নেতাকর্মী, ছাত্র শিবির ও আল-বদর, রাজাকার, আল-শামস্ বাহিনীর নিষ্ঠুরতা। ঘৃণা করেন এদেরকে। জাতিদ্রোহীতামূলক, মানবাধিকার বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্যে বিচার চান এই নরপাষণ্ডদের। বর্তমান প্রজন্ম এবং বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে চান এদের দ্বারা সংঘটিত মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধমূলক ঘটনাবলি। তাই, সাগ্রহেই সহযোগিতা দিতে সম্মত হন তিনি। বসলাম তার চেম্বারে। কাজের পরিকল্পনা নিয়ে কথা হলো অনেকক্ষণ। বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য প্রমাণ দিয়ে যারা সহায়তা করতে পারেন সে রকম কিছু লোকের তালিকাও তৈরি করি আমরা।

কানাইঘাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নূরুল আম্বিয়া চৌধুরী। কানাইঘাটেই তার বাড়ি। রাজনীতির সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন–সেই ছাত্র জীবন থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছেন অত্যন্ত কাছে থেকে। রাজাকার, আল-বদর, আল শামস্, শান্তি কমিটি এবং জামায়াত-শিবিরের জাতিদ্রোহীতামূলক ক্রিয়াকলাপ দেখার সুযোগ হয়েছে প্রতিনিয়ত। ৯ মাস সময় কাটিয়েছেন হায়নার মুখোমুখি। ছিলেন ভীতসন্ত্রস্ত। কিন্তু সে সব কথা মুখ ফোটে প্রকাশ করতে পারেননি কখনো। প্রথমত: স্বাধীনতার পর সরকার বা কোনো সংস্থা কখনো জানতে চায়নি এ সম্পর্কে। ফলে, ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করতে পারেননি কারো সাথে কখনো। দেশি বিদেশি কোনো গবেষক বা ইতিহাসবিদও নিয়ে কাজ করার গরজ অনুভব করেননি। অন্যদিকে '৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দেশ চলে যায় ভিন্ন ধারায়। স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের কল্যাণে পেয়ে যায় রাজনীতি করার অধিকার। লাভ করলো রাজনীতি করার লাইসেন্স। পাকিস্তানি ধারার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চালু হলো দেশে। কুখ্যাত গোলাম আযম–যে ছিল পাকিস্তানি নাগরিক–তাকে ফিরিয়ে আনা হলো দেশে। দেয়া হলো নাগরিকত্ব। কবর থেকে টেনে টেনে তুলে আনা হয় জামায়াত-মুসলিম লীগের নেতা–যারা বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে যুক্ত হয়েছিল গণহত্যা ও নারী নির্যাতনে। শাহ্ আজিজুর রহমানের ন্যায় ঘৃণিত দালালকেও জিয়াউর রহমান করেছিল প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তীতে জিয়ার সামরিক ছাউনিতেও গড়া দল বি, এন.পির ছত্রছায়াই ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠে মুক্তিযুদ্ধের এই পরাজিত শক্তি। সে কারণে কথা বলার শক্তি, সাহস হারিয়ে ফেলেন অনেকেই। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থায় নূরুল আম্বিয়া চৌধুরীও মনের কথা বলতে পারেনি মন খুলে। ডা. ফয়জুল হকের সাথে দীর্ঘ আলাপ শেষে কথা বলতে চাই উনার সঙ্গে। কিন্তু তিনি তখন স্কুলে। সেখানেই যাই আমি। ইতোমধ্যেই এসেছেন বাহাউদ্দিন। নিজে থেকেই এসে পরিচিত হন কিবরিয়া সিরাজী। আর অল্প বয়সী এক কিশোর নজরুল ইসলাম। তখনো স্কুলের শিক্ষার্থী। ছাত্র লীগের একজন কর্মী। সাথে তার একটি মোটর বাইক। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবার ইচ্ছে ব্যক্ত করতেই নিয়ে যায় সেখানে। দেখা হলো শিক্ষক নূরুল আম্বিয়া চৌধুরীর সঙ্গে। সংক্ষেপে জানালাম

সেখানে যাবার উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি কথা বলতে পারবেন না। বললেন, স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে বাজারে আসবেন–আধা ঘণ্টার মধ্যেই। সেখানে কথা বলবেন তিনি। এরই মধ্যে নজরুল নিয়ে যায় বিষ্ণুপুর। ছবি তুলে গণ কবরের। কিছু লোকের সঙ্গে কথাও বলি।

নূরুল আম্বিয়া আসলেন–ডা. ফয়জুল হকের চেম্বারে। তাদের এলাকার ক'জন যুদ্ধাপরাধীর অপরাধমূলক তথ্য সংগ্রহ করতে চাই–জেনে খুশি হন। সহায়তা দেবারও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। প্রাথমিক আলোচনা শেষে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে স্থানীয় একজন সাংবাদিক আনিসুল আমলাকে ডেকে পাঠান। তাকে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্বও দেয়া হলো। এভাবেই কেটে যায় দিন। নূরুল আম্বিয়া আমাকে আশ্বস্ত করে বলেন–তথ্য পেতে সমস্যা হবে না। অনেকেই কথা বলতে রাজি হবেন। যদিও সেটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে–গুন গুন করে গাইলেন, 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল/শুধাইলো না কেউ। স্বাধীনতার ২৩ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। এর মধ্যে কেউ কোনোদিন তো জানতে যায়নি এ বিষয়ে। না সরকার বা সরকারি দল, কোনো রাজনৈতিক সংস্থা বেসরকারি সংস্থা–কেউ না। এমন কথা বলতে বলতে এক সময় আমাকেই আক্রমণ করে বসেন। 'আপনি তাজুল মোহাম্মদ, আপনি যখন একটু আগে এসেছেন, তখন মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের, আহতদের, ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা করেছেন মূলত নারী নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ অন্যায় ঘটনা। তালিকা নিয়েছেন শান্তি কমিটি, আল বদর, রাজাকার, আল শামসের। কিন্তু এত গভীরে যাননি। এখন এ সব প্রশ্ন করলে হয়তো আরো সহজে উত্তর পেয়ে যেতেন। কারণ, তখনো স্বাধীনতা বিরোধীরা এতটা শক্তিশালী ছিল না। যাই হোক এর পরও আমাদেরকে সাহায্য করবেন তিনি। যারা এ বিষয়ে আরো অধিক জানেন–তাদের সঙ্গে যোগাযোগও করিয়ে দেবেন। এবারে বিদায়ের মালা। না, সে অবশ্যি সে দিনের মতো। সুরমার অপর তীরে আমাদের গাড়ি। সেখানে আসেন আনিসুল আলম, নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্যরা। তুলে দেন গাড়িতে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে চারখ অবধি আসতে চান কুতুব আলী। কানাইঘাট থানারই সিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য তিনি। তার স্মৃতিতেও আছে অনেক অভিজ্ঞতা। সেসব শুনতে শুনতে পৌঁছে যাই চারখাই। স্থানটি বিয়ানীবাজার থানার অন্তর্গত। এ চারখাই দিয়েই সড়ক পথে যোগাযোগ কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, সূতারকান্দি, বারইগ্রাম প্রভৃতি স্থানের। সুতরাং স্থানটির গুরুত্ব নানা কারণেই সমাধিত। জামায়াত-শিবিরের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় এখানে প্রাণ দিয়েছেন অগুণতি বাঙালি। পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারকে হত্যা করেছে জামায়াতিরা নিজ উদ্যোগে এবং নিজেরাই। এমন কি পুকুর থেকে তার লাশ পর্যন্ত উঠাতে দেয়নি পাষণ্ডরা। স্বাধীনতার পর মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী এসে পুকুর থেকে কংকাল তুলে দাফন করেন। আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজী (মরহুম) ও মসুদ আহমদ চৌধুরীকে

(হরহুম) সাথে নিয়ে সামরিক কায়দায় স্যালুট করেন পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারের কবরে।

আমরা যখন চারখাই পৌঁছালাম তখন বৃষ্টি ঝরছে মুষলধারে। প্রকৃতপক্ষেই শ্রাবণের ধারা। গাড়ি থামাতে বললাম–চৌমুহনী অতিক্রম করার পরই। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই রওয়ানা করি পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারের বাড়িতে। হ্যাঁ, সাথে ছিলেন কয়সর আহমদ। তিনি একটি ছাতা নিয়ে আসেন আমার সঙ্গে কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। ভিজে জবজবা হয়ে ঢুকে যাই আব্দুল মালিক মাখন মিয়ার বাড়িতে। পীর ইয়াজ মিয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই নিজে থেকে জানালেন 'পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারকে হত্যা করার জন্যে জামায়াতে ইসলামি মিছিল করে বাড়িতে আসে। আর, সে মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা লুৎফর রহমান। আর আমার বাড়িই প্রথম আক্রান্ত হয়। এই যে আপনি যেভাবে তাপাদার-বাড়িতে যাবার জন্যে এসে ঢুকে গেলেন আমার বাড়িতে। ঠিক সে ভাবেই ওরাও প্রথম আক্রমণ করে আমার বাড়ি। ভাগ্যক্রমে সে প্রাণে রক্ষা পাই আমি।'

সংবাদ প্রেরণ করি ডেভিড বার্গম্যানকে। নিয়ে আসা হয় তাকে পীর বাড়িতে। ১০ বছর পরে এ বাড়িতে আসা। ১৯৮৪ সালে এসেছিলাম একা। একরাত অবস্থান করে সংগ্রহ করেছিলাম পরিবার সদস্যদের সাক্ষাৎকার। আর, ১৯৯৪ সালে আসা হলো বিদেশি গবেষকসহ। ইয়াজ মিয়ার ছেলেদের অনেকেই ছিলেন বাড়িতে সাক্ষাৎকার নিতে চাই আবার সবার। তাদের পিতাকে হত্যা করেছে জামায়াতের লোকেরা। আর, নেতৃত্ব দিয়েছেন হাফেজ মাওলানা লুৎফুর রহমান, মাওলানা আবু সায়ীদ, মাওলানা শামসুল হক, মঞ্জুর হাফিজ প্রমুখরা। কিন্তু পীর ইয়াজ মিয়ার ছেলেরাতো বাড়িতে ছিলেন না–ঘটনার সময়। কারণ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান তারা আগেই। তা হলে কেমন করে জানলেন মিছিলকারীদের পরিচয়? উত্তরে জানালেন–প্রথমত মায়ের মুখ থেকে শুনেছেন কাহিনীর বর্ণনা। যিনি নিজেও নিগৃহীত হয়েছিলেন পাষণ্ড জামায়াত নেতাদের হাতে। দ্বিতীয়ত মিছিলে অংশ গ্রহণকারীদের অনেকেই বর্ণনা দিয়েছেন তাদের কাছে। কারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন মিছিলে এবং এর মধ্যে কে কে ঘটনাটি অবহিত করেছেন তাদেরকে? সাক্ষাৎকার নিতে চায় তাদেরও। শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি। ওদের দেয়া নাম পরিচয় অনুযায়ী খুঁজতে গিয়ে চারখাই বাজারেই পাওয়া গেল এখলাছ আলীকে। চারখা নোয়াখালি গ্রামে তার নিবাস। নিয়ে আসা হলো এ পীর বাড়িতেই। এখানে বসে বসে শুনি এক হৃদয় বিদারক কাহিনী। কোনো হৃদয়বান লোকই এরকম লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনায় স্বাভাবিক থাকতে পারে না। চোখ গড়িয়ে জল আসে উপস্থিত লোকজনের। এমন কি আমার নিজেরও। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে হয়েছে কয়েকবার।

গদারবাজার হয়ে মিছিল এগিয়ে আসছে চারখাইয়ের দিকে। সামনে জামায়াতের জেলা এবং থানা পর্যায়ের নেতারা। তাছাড়াও রাস্তার দু'পাশের প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে

জামায়াত নেতারা ডেকে নিচ্ছেন গ্রামবাসিকে কোথাও কোথাও জোর চালাচ্ছেন সাধারণ মানুষের উপর। এখলাছ আলীকেও সেভাবেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে মিছিলে। বলা হয়েছে তারা যাচ্ছেন পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারকে হত্যা করতে। তবে, এখলাছ আলীকে প্রথম আঘাত করতে হবে। এখলাছ আলী তা করতে অস্বীকৃত হন এবং এ ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ লোকটিকে হত্যা না করার জন্যে হাত জোড় করে অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। কিন্তু ফল হয়নি কিছুই। মিছিল এগিয়ে চলে মারমুখি জামায়াতিদের। সে মিছিলে তাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জোর করে। নিয়ে আসা হলো পীর বাড়িতে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হয় তাকে। অবশেষে প্রাণ দিতে হলো এই আশীতিপর বৃদ্ধ খোদা ভক্ত এক মুসলমানকে। এমনকি লাশের জানাজা পড়া কিংবা দাফন করতেও দেয়নি ইসলামের লেবাস পরা জামাতিরা। ফেলে দেয়া হয়েছিল তাকে পুকুরের জলে। মধ্য রাত অবধি চলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ। এখলাছ আলী, আজমল আলী তাপাদার, হাজী জমির উদ্দিন তাপাদার, আলাউদ্দিন তাপাদার প্রমুখ দিয়েছেন প্রচুর উপাত্ত। হস্তান্তর করেন এ সংক্রান্ত প্রচুর দলিলপত্রও সেসব নিয়েই রওয়ানা হই সিলেট অভিমুখে।

১৪ আগস্ট ১৯৯৪ সাল। অবিরত ঝরছে বৃষ্টি। এর মধ্যেও কাজ শুরু করতে হলো সকাল ৮টায়। মোহাম্মদ ফারুক আহমদ, দিয়েই শুরু করি আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। এ.বি. ব্যাংকের ম্যানেজার মাহবুবুল হক, সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, (সাংসদ), মুহিবুর রহমান এহিয়া (মরহুম), এ. এইচ. সাদত খান (মরহুম)সহ আরো অনেককেই খুঁজে খুঁজে বের করতে থাকি। দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজীর (মরহুম) বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। একই সাথে লাঞ্চও সেরে নেই সেখানে। সৈয়দ মোস্তফা কামাল (মন্তই), সদর উদ্দিন চৌধুরী, হেরাস্ত রশীদ চৌধুরী ও ফাহিমদা রশীদ চৌধুরীসহ আরো অনেকের সাথেই কথা হয় আমাদের। আর এভাবেই শুরু হলো টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশনের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত গবেষণা কর্ম। যাদের সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছি, তাদের কেউ কেউ এ বিষয়ে কথা বলতে প্রকাশ করেছেন অপারগতা। অনেকেই এড়িয়ে গেছেন আমাদের। কারো কারো চোখে-মুখে প্রত্যক্ষ করেছি ভীতির ছাপ। তবে, কোনো কোনো ব্যক্তি যেন মুখিয়েই ছিলেন কথা বলার জন্যে। সেই যে 'বলিতে ব্যাকুল–শুধাইলো না কেউ।'

ডেভিড চলে যাবেন ঢাকায়। সেখান থেকে লন্ডন। আমাকে কাজ করতে হবে একা একা নিজের মতো করে। যেভাবে করে আসছি সেই ১৯৮০ সাল থেকে। প্লেনের রিটার্ন টিকেটখানা ফেরৎ দিয়ে মূল্যও নিয়ে আসা হয়েছিল। তাই দেওয়ান ফরিদ গাজী নিজের ড্রাইভার পাঠিয়ে রাতের ট্রেন উপবন এক্সপ্রেসের একটি টিকেট আনিয়ে দেন। আমিও তুলে দেই সে ট্রেনে। তার পর ক্লান্ত দেহে ফিরে আসি বাসায়। পরিকল্পনা করতে থাকি পরবর্তী কাজের।

জামায়াতের হত্যা তালিকা : বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে

পরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যার জন্যে তালিকা তৈরি করেছে জামায়াত। এর জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, নেতাকর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাস্তবায়নেও ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এসবের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারের হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে। ২৫ মার্চের পর পরই কানাইঘাট ও বিয়ানীবাজার এলাকার জামায়াত নেতারা চারখাই উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে একটি সভা আহ্বান করেন। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মাওলানা শামসুল হক, মাওলানা লুৎফর রহমান, মঞ্জুর , হাফিজ, শফিক মিয়া, লাল মিয়া, আব্দুল কাদির প্রমুখ। লোকজন উপস্থিত হয় কয়েক শ'। এরা সবাই জামায়াতে ইসলামির জেলা, মহকুমা ও স্থানীয় নেতা। শামসুল হক তখন সিলেট জেলা জামায়াতের আমীর এবং সেক্রেটারি জেনারেল লুৎফুর রহমান। সে সভার সভাপতি ছিলেন সম্ভবত শামসুল হক এবং পরিচালনার দায়িত্বে লুৎফুর রহমান। সভায় ৫০ জন লোককে পাকিস্তান ও ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে হত্যা করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। আর এ তালিকা তৈরি করেন লুৎফুর রহমান। নিজ হাতেই নামগুলো লিখছিলেন। ফাতির আলী তখন ছিলেন স্কুলের সীমানা দেয়ালের বাইরে। নিজেকে আড়াল করে করে শুনেছেন সকল বক্তব্য। তালিকায় ছিল তার নিজের নাম, ভাইদের নাম এবং পিতার নামও। ফাতির আলীর মতে সেখানে পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন এবং তালিকা তৈরি করে তা তুলে দেয়া হয়েছিল তার হাতে। তবে, সে তালিকায় কতটি নাম ছিল–তা নিয়ে রয়েছে ভিন্ন মত। কেউ বলেছেন ৫০ জন লোকের নাম। কারো মতে ৪০। আবার ২৩ জনেরও নাম উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ।

সভার পরের দিন। পীর বাড়িতে অবস্থানরত পাকসেনারা ডেকে পাঠায় ফাতির আলীকে। জিজ্ঞেস করে ভোট দিয়েছেন কোনো দলে। ফাতির আলী জানান, 'মুসলিম লীগে।' সাথে সাথে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে পাকি সেনাধ্যক্ষ গালাগাল করতে করতে এক পর্যায়ে ফাতির আলীকে গুলি করার নির্দেশ দেয় সিপাহীদের। আর, সে নির্দেশ পালন করার পূর্বে পালিয়ে যান তিনি বাড়ি ছেড়ে। ফেরেননি আর স্বাধীন না হওয়া অবধি।

হত্যা তালিকা সম্পর্কে আরো অধিক তথ্য প্রদান করেন লাংলাকোনা গ্রামের মুসলেহ্ উদ্দিন আহমদ। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য বাহিনীর আজ্ঞাবহ দালাল জামায়াতিরাই সভা আহ্বান করেছিল বলে নিশ্চিত করেন তিনি। জোর করে কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সভায় লোক সমাগম করিয়েছিল বলেও দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। জামায়াত নেতারা সেদিন অতি উৎসাহী হয়ে, পাকিস্তান ও ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে কিছু লোকের একটি তালিকা প্রণয়ন করে। তার মতে 'এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল হাফেজ মাওলানা লুৎফুর রহমান। নিজ হাতেই তিনি একটি একটি করে নাম লিখে লিখে প্রণয়ন করেন

লিস্ট। বলেন, এরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি বিরোধী। ফলে, ইসলামেরও শত্রু। তাই ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের শত্রুদের কতল করার জন্যে তালিকাটি তুলে দেন তারা পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের হাতে।' মুসলেহ্ উদ্দিন আহমদ জানান, সে তালিকায় ছিল ৪০টি নাম। এর মধ্যে অন্যতম হলেন তার পিতা মজম্মিল আলী, চাচা রুস্তম আলী, আমির উদ্দিন, তাপাদার বাড়ির আজমল আলী (পাখি মিয়া) ও তার কয়েকজন ভাই। বলেন, তার নিজের নামও ছিল বলে জেনেছেন বিভিন্ন সোর্স থেকে। তাই, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। সে কারণে প্রাণ রক্ষা হয়েছিল এবং আজ আমাদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছেন। তালিকা অনুযায়ী তাদের বাড়িতেও গিয়েছিল জামায়াত সৃষ্ট রাজাকার বাহিনী। তাদেরকে না পেয়ে পুরো বাড়িটিই ছাই-ভস্মে পরিণত করে দেয় অগ্নি সংযোগে। এর আগে লুট করে নিয়েছে সমস্ত অস্থাবর সম্পতি।

নোয়াখালি গ্রামের মতিউর রহমান (রশিদ মিয়া) কে হত্যা করার জন্যে দায়ী শামসুল হক, লুৎফর রহমান এবং আব্দুর রহিম (বচন হাজী)। কাদি মল্লিক গ্রামের গাড়ি চালক আব্দুল হামিদ চৌধুরীকেও হত্যা করিয়েছিলেন বচন হাজী। তিনি মনে করেন চারখাই উচ্চ বিদ্যালয়ে জামায়াত আয়োজিত সভা এবং হত্যা তালিকা প্রণয়নই ছিল এসব হত্যাকাণ্ডের মূল প্রেরণা। যুক্ত করেন আল বদর বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনীও। বলেন, 'কানাইঘাট থানার কুখ্যাত শিবির নেতা আবু সায়ীদ এবং বিয়ানীবাজারের আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন মুরারী চাঁদ কলেজের ছাত্র। এরাই গঠন করেন জেলা আল বদর বাহিনী। সমগ্র জেলা ব্যাপী পরিচালিত তাণ্ডবের নেপথ্য নায়ক এই আবু সায়ীদ, ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী (সাংসদ), আব্দুর রাজ্জাক, ওমর আলী আফজাল চৌধুরীরা।'

'জামায়াত প্রণীত হত্যা তালিকার ৪০ নয় ২৩টি নাম ছিল।' এ দাবি করেছেন কামরুল ইসলাম। সে তালিকা অনুযায়ী রাজাকার বাহিনী নোটিশ নিয়ে গিয়েছে আব্দুল হালিম (হালিম মিয়া), লালন মিয়া, আহম্মদ আলী, শফিক মিয়া এবং তার নিজের বাড়িতে। শেওলা ডাক বাংলায় ক্যাপ্টেনের দরবারে হাজির হবার নির্দেশও প্রদান করে তাদেরকে। ২৩ জনের মধ্যে তিনি নাম উল্লেখ করেন–ফখরুল ইসলাম, মুয়মান আলী, দৌলতুজ্জামান, শেরুজ্জামান, রশিদ আলী, আব্দুল খালিক, আব্দুর রব, নূরুল ইসলাম আসদ্দর আলী, নূর উদ্দিন, মাসুদ আলী, হারিছ আলী, ময়না মিয়া, আরমিন আলী, আলাউদ্দিন, লুৎফুর রহমান, সয়ফুল ইসলাম, রুস্তম আলী ও তার নিজের।

কামরুল ইসলাম, মুসলেহ্ উদ্দিন আহমদ, ফাতির আলী এবং অন্যান্যদের দেয়া তথ্য সম্পর্কে জানতে চাই ফখরুল ইসলামের কাছে। সবার বক্তব্যকেই সমর্থন করে তিনি জানান–তালিকাভুক্ত প্রতিটি লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়েছে জামায়াতে ইসলামি দ্বারা গঠিত রাজাকাররা। ডাক বাংলোতে গিয়ে পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর ক্যাপ্টেনের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দিয়েছে সবাইকে। আগেইতো জামায়াতিরা মিছিল করে করে পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারের বাড়ি আক্রমণ করে এ ঘটনার পর পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে যান বাড়ি থেকে। আর, পলাতক অবস্থায় ঘরোয়া গ্রামের এক জঙ্গলে জন্ম নেয় তার পুত্র সহিদুল ইসলাম সাজু।

তালিকাভুক্ত আরেক চারখাইবাসী শেরুজ্জামান। হত্যা তালিকার কথা স্বীকার করে বললেন–জামায়াতের হত্যা তালিকা সম্পর্কে প্রতিটি লোকই অবহিত। হয়তো রাজনৈতিক কারণে কেউ কেউ এখন স্বীকার করবেন না। আবার প্রাণের ভয়েও মুখ বন্ধ রাখবেন অনেকেই। এই তালিকার সূত্র ধরে আলাপ করি আরো অনেকের সঙ্গে। সংখ্যার হেরফের করে তালিকার কথা স্বীকার করেন সবাই।

ফাতির আলীসহ আরো অনেকের মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে তথ্য। একদিন পাকিস্তানি সামরিক যানে করে নিয়ে আসা হয় অজ্ঞাত পরিচয়ের মৃতদেহ। কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কি কারণে, কোনো স্থানে হত্যা করা হয়েছে, কি তাদের পরিচয়, কিছুই জানা যায়নি। তবে, লাশগুলোর সঙ্গে সামরিক যানের চালক ছাড়াও ছিল জামায়াতের কয়েকজন লোক। চারখাই থেকে গাড়ি চললে উত্তরমুখি হয়ে সুরমা তীরের গাদারবাজার অবধি। গ্রামবাসীদের ডেকে এনে গর্ত খনন করে বাধ্য করে পাক সৈন্য এবং জামায়াতিরা। সেই জামায়াত নেতাদের অনেককেই চিনতেন গ্রামবাসী। কিন্তু ভয়ে আতংকে সে বিষয়টি প্রকাশ করেননি তারা। আর, গর্ত খনন শেষ মৃতদেহগুলো সে গর্তে পুঁতে রাখতে গিয়ে নিরুপণ করেন তারা সংখ্যা। তাদের নিকট থেকেই জানা গেল–ওইদিন ১৭ জন নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করে সুরমা তীরে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে।

কানাইঘাট থানার একটি গ্রাম গাছবাড়ি। সে গামেরই নূরুল হকের সঙ্গে কথা হলো তার বাড়িতে বসেই। সেদিন ছিল ১৯৯৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। মুক্তিযুদ্ধের আগেই নূরুল হক ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আওয়ামী লীগকে সমর্থন করতো বললেই হবে না আওয়ামী লীগের কর্মী ছিলেন এলাকায়। দলের অন্যান্য নেতাকর্মী ওমর আলী, নিজাম উদ্দিন, ফয়জুর রহমান, কুতুব আলী ও আহমদ আলীর সঙ্গে যেমন ছিল মধুর সম্পর্ক–তেমনি চিনতেন অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীদেরও। একই থানার ছত্রপুর গ্রামের বাসিন্দা মঞ্জুর হাফিজ। খুব ভালোভাবেই চিনতেন তাকে। চারখাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জামায়াতি সভার অন্যতম উদ্যোগতা হিসেবে অভিহিত করেন মঞ্জুর হাসিবাকে। মিছিল সংগঠনেও ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর জলশাহ পীরকে (পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারকে এনামে অভিহিত করতেন অনেকে) হত্যার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। এসব তথ্য দেবার পাশাপাশি আরো জানান বড়দেশে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। কানাইঘাটের বড় দেশ গ্রামেই শফই লন্ডনির (লন্ডন প্রবাসী বলেই হয়তো এভাবে বলা হয়ে থাকে) বাড়ি। জামায়াত নেতা মঞ্জুর হাফিজ হাজির হন সেখানে একদিন। সাথে অন্য দুই দালাল ফজলে হক ও জহরুল হক (সহোদর ভাই)। নিজেরাই পুড়ায় শফই লন্ডনির বাড়ি।

স্বাধীনতার পর ওরা সবাই ছিল পলাতক। সিলেট শহরের সুরমা বোর্ডিং থেকে ডা. ফজলুল হক এবং নূরুল হক মিলেই ধরেছিলেন ফজলে হককে। তারপর সোপর্দ করেন পুলিশে। তিনি বলেন লুৎফুর রহমান, আবু সায়ীদ এবং ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীদের প্ররোচনাতেই আক্রান্ত হয়েছিল ফজল গ্রামের মনিন্দ্র মাস্টারের বাড়ি। পাকিস্তানি সৈন্য এবং জামায়াতের রাজাকার আল বদর বাহিনী চালিয়েছে দুনিয়ার জঘন্যতম কুকর্ম। তাদের এ ক্ষা ফজলুর রহমান মেম্বার (মরহুম), আব্দুল নূর, মাস্টার এবং আব্দুল মছব্বির জিন্নাহ্সহ অনেককে ধরে নিয়ে যায় সিলেট সার্কিট হাউসে। সেখানে তাদের উপর চালায় অকথ্য নির্যাতন।

হাফেজ মাওলানা লুৎফুর রহমান সম্পর্কে নূরুল হক দিয়েছেন অনেক তথ্য। জামায়াতে ইসলামির জেলা সেক্রেটারি হিসেবে বসবাস করতেন সিলেট শহরে। তবে প্রায়ই আসা-যাওয়া ছিল এলাকায়। আসতেন আর্মির গাড়িতে করে–একজন ডি. আই.জি. হিসেবে। পাকিস্তানি সৈন্যরা পালন করতো তার আদেশ নির্দেশ। অনেকগুলো সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। বলতেন 'যারা পাকিস্তানের বিরোধীতা করছে এবং পাকিস্তান ভাঙ্গার চেষ্টা করছে–তারা কাফের। এদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। তার সরাসরি নির্দেশেই লুণ্ঠিত হয়েছিল হরিসিংহ বাড়ির কুতুব আলী, ছত্রপুরের ফয়জুর রহমান (ফজই মেম্বার), সফিক উদ্দিন কাজল এবং মাহমুদ আলীর বাড়ি। স্বাধীনতার পর লুৎফর রহমানের বাড়ি এবং তার গ্রামবাসী গ্রামের আরো অনেকের বাড়ি থেকেই লুটের মালামাল উদ্ধার করা হয়েছিল।

তার মতে গাছ বাড়ি এলাকায় তখন লুৎফর রহমানের ভাই ছিল আল-বদর কমান্ডার এবং পরম পরাক্রমশালী। নিজে নিজেই নাকি পদবী গ্রহণ করেছিল ক্যাপ্টেন। পুরো এলাকা জুড়ে আফতাবুর রহমান সম্পাদন করেনি–এমন কোনো কুকর্ম ছিল না। 'এই আফতাব সশস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করতো সব সময়'- জানালেন মাহমুদ' আলী। তিনি বলেন, আবদুর রাজ্জাক (ব্যারিস্টার), লুৎফর রহমান, আবু সায়ীদ, ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীরা ছিলেন জেলা পর্যায়ের নেতা। কাজ করতেন শহরে। তবে, স্থানীয় আল বদর, রাজাকার, আল সামস্ শান্তি কমিটি সবাই কাজ করতো তাদেরই নির্দেশমতো। তার মতে শাহবাড়ি এলাকার মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক যেমন ছিলেন নিজাম উদ্দিন, সিরাজ উদ্দিন, ওমর আলী, নূরুল হক, ফয়জুর রহমান এবং আব্দুল মছব্বির জিন্নাহ; তেমনি হানাদার বাহিনীর দালালি করেছেন লুৎফুর রহমান, আফতাবুর রহমান, মৌলভী ইসহাক ও ইব্রাহিম আলী মেম্বাররা।

অনেকের জবানী থেকেই এসেছে আব্দুল মছব্বির জিন্নাহর নাম। খুঁজে বের করি তাকেও। ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'মাওলানা শামসুল হক হাফেজ মাওলানা লুৎফুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা আবু সায়ীদ এবং ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীরা ছিল জামায়াত এবং শিবিরের জেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতা। মুক্তিযুদ্ধকালে জাতির বিরুদ্ধে এরা কাজ করেছে। গণহত্যা, নারী নির্যাতন পর্যন্ত জায়েজ বলে ফতোয়া

দিয়েছে। নিজেরাও এসব কাজে অংশ গ্রহণ করেছে। এসব কথা দেশের মানুষ জানে। নতুন করে বলার প্রয়োজন আছে কি? প্রকাশ্যে জনসভা করে বলতো যারা পাকিস্তানের বিরোধীতা করছে–তারা কাফের। তাদেরকে কতল করা জায়েজ। এসব জানতেন এলাকার লোকজন। এখনো ভুলে যাননি কেউ। ভুলার কথা নয়–এসব।' তিনি বলেন প্রয়োজন হলে, তাদের এলাকার প্রতিটি নারী-পুরুষ সাক্ষ্য প্রদান করবে।

আজমল আলী তাপাদারও জানিয়েছিলেন জামায়াত ইসলামি কর্তৃক প্রস্তুত করা তালিকার কথা। তিনি জানান, শত শত লোকের মিছিল সংগঠিত করেছিল জামায়াতে ইসলামি। আর, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন শামসুল হক, লুৎফুর রহমান, আবু সায়ীদ, মস্ত মিয়া প্রমুখ। তার মতে প্রথমেই জামায়াত নেতারা পাকিস্তানি সেনা অফিসারের হাতে একট তালিকা তুলে দিয়ে বলেছিলেন 'এরা পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী। সুতরাং এদেরকে হত্যা করতে হবে।' এছাড়াও পাকিস্তানি সৈন্যরা ঐ তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের খোঁজ নেবার আগেই জামায়াতিরা হত্যা করে পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারকে।

আজমল আলী তাপাদার, সফিক উদ্দিন কাজল, মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, কামরুল ইসলামসহ অনেকেই একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন–আনুষ্ঠানিকভাবে রাজাকার বাহিনী গঠনের আগেই জামায়াতের লোকজন সে এলাকায় রাজাকারের ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে এদের কেউ কেউ হয়েছে-'আল-বদর' বাহিনীর সদস্য। আর, অধিকাংশই থেকে যায় রাজাকার বাহিনীতে। এলাকায় চালিয়েছে অরাজকতা। অগুনতি মানুষকে ধরে ধরে তুলে দিয়েছে পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর হাতে।

এ বিষয়ে যারা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকে উত্থাপিত হয়েছে একটি কমন প্রশ্ন। তাদের জিজ্ঞাসা–জামায়াত, মুসলিম লীগ, জি.ডি.পি. নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল আমাদের স্বাধীনতা বিরোধীতা করেছে। নানা বাহিনী গঠন করে সে-সব বাহিনী পরিচালনা করেছে। জাতির বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করেছে–হানাদার বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগকে জায়েজ বলে ফতোয়া জারি করেছে। নিজেরা উদ্যোগী হয়ে পাকিস্তান বিরোধীদের তালিকা তৈরি করে তাদেরকে হত্যা করার জন্যে পাক সৈন্যদের অনুরোধ জানিয়েছে–প্রভাবিতও করেছে। এমন কি নিজেরাও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। তাদের বিচার হয়নি কেন? কেন কোনো সরকার এদেরকে বিচারের মুখোমুখি করেনি।

এ বিষয়ে সরকার যেমন নিরব থেকেছে–তেমনি রহস্যজনক ভূমিকা পালন করেছে অন্যরাও। বেসরকারি সংস্থাসমূহ, মানবাধিকার সংগঠন, দেশি বিদেশি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ বিষয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। যারা কথায় কথায় গণতন্ত্রের জয়গান গাইতে চান, যারা মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে ফেরেন বিশ্বময়–তারাতো

কখনো মানবতার সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনাকারীদের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করেননি। এর কারণটা কী? ত্রিশ লাখ পরিবার কি কখনো পাবে না স্বজন হত্যার বিচার? লাখ লাখ মা-বোনকে যারা লাঞ্ছিত করেছে তারাও থাকবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে? বিচারের বাণী কি স্বাধীন দেশেও কাঁদবে নিরবে নিভৃতে?

প্রতারণা : জামায়াত স্টাইল

কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর তথ্য সংগ্রহ করতে চষে বেড়াচ্ছি সিলেট শহর এবং থানাগুলো। শহরে কাঠের ব্যবসা রয়েছে বশির আহমদের। সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত আছে তার নাম। সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন নিজের কথা। ২৯ এপ্রিল রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যায় তাকে পাকিস্তানি আর্মি। আর ধরিয়ে দিয়েছিল মাসুদ নামক একজন দালাল। তিনি বলেন আম্বরখানা মসজিদটি তখন পাকসেনা বাহিনীর ক্যাম্প এবং জামায়াতের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাকেও নিয়ে যায় সেখানে। খোদার ঘরে নিয়ে নির্যাতন চালিয়েছে তার উপর। সেখানে দেখেছেন জামায়াত এবং ছাত্র শিবিরের বহু নেতাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কুখ্যাত আবু সায়ীদ। তার মতে সিলেট জেলা ছাত্র শিবিরের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা মাওলানা আবু সায়ীদ। আল-বদর বাহিনীর ক্যাম্প পরিচালনা করতো সে এবং ঘুরে বেড়াতো পাকিস্তানি মিলিটারির গাড়িতে করে। এছাড়াও সেখানে দেখেছেন আল-বদর কমান্ডার আব্দুল আজিজ। আব্দুস সালাম ও কুদরত-এ-এলাহীকে। এ সময় আরো সাক্ষাৎকার নেই সাবেক এ. পি. পি. মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী এডভোকেট, ডা. হারিছ আলী, দ্বিজেন্দ্র কুমার ঘোষ, এনাম আহমদ, সিরাজুল ইসলাম, সাইফুর রহমান খান, মাহতাব (জঙ্গী মাহতাব), সাবেক পি-পি. মনির উদ্দিন আহমদ এডভোকেট এবং শাব্বীর জালালাবাদির। একাত্তরে ২৪ বছর বয়সী শাব্বীর। পড়াশোনা করতেন তখন আলিয়া মাদ্রাসায়। আর আবু সায়ীদও সে মাদ্রাসার ছাত্র। তাই, চিনতেন তাকে। সে সময় জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি কিংবা সহ-সভাপতি ছিল। বাস করতো শাব্বীরের বাড়ির একেবারেই কাছে রাজারগলিতে। ভাড়া নেয়া ঘরের নাম দিয়েছিল তারা 'শহীদ আব্দুল মালিক ছাত্রাবাস।'

শাব্বীর জালালাবাদির তথ্য যাচাই করতেই রাজারগলিতে গিয়ে হাজির হই। সনাক্ত করি বাড়িটি। বাড়িওয়ালা মালিক হোসাইন হাজ্জাই। যোগাযোগ হলো তাঁর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার দিতেও রাজি হলেন তিনি ঠিক হলো দিনক্ষণ। কথা বলতে শুরু করলেন এভাবে–'একদিন বাড়িতে এসে হাজির হন এক লোক। নিজের পরিচয় দিলেন মাওলানা আবু সায়ীদ বলে। ইমামতি করেন কোনো এক মসজিদে। বাড়ি থেকে নিয়ে আসবেন তার স্ত্রী-সন্তানদের। এর জন্যে একটি বড় বাড়ি প্রয়োজন। পছন্দ হয়েছে আমাদের এলাকা এবং বাড়িটিও। ভাড়া নিতে চান এটি। কথাবার্তা বলে মাসিক ১ হাজার টাকা ভাড়া ঠিক করা হলো। বুঝে নিলেন বাড়ির চাবি। এর পরপরই

এসে উঠলেন ৭/৮ জন ব্যাচেলার। প্রথম থেকেই ওদের চলাফেরা ছিল সন্দেহজনক। আচরণে উদ্ধত, কথাবার্তা লাগামহীন এবং শালীনতা বর্জিত চালচলন। অবাক হয়ে যাই আমরা। খুঁজতে থাকি মাওলানা আবু সায়ীদকে। কিন্তু তিনি আসেন ক্যাডার পরিবেষ্টিত হয়ে-সেনাপতি সদৃশ। মিটিং করেন আমার বাড়িতে। আবার চলেও যান একইভাবে। অথচ আমি কথা বলার সুযোগও পাই না। বাড়ি ভাড়া পাওয়াতো দূরের কথা সেখানে বসবাস করাও কষ্টকর হয়ে পড়ে। অল্প দিনের মধ্যেই বাড়িটি ব্যবহার করতে থাকে রাজনৈতিক কার্যালয় এবং মৌলবাদী ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্র হিসেবে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কালেও এটি ব্যবহার করেছে নির্বাচনী কার্যালয় হিসেবে। এরপর আবু সায়ীদরাও কিছুদিন হয়ে যায় নিখোঁজ। পাইনি তাদের কাউকেই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ওরাও হয়ে উঠে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী। সে সময়ে প্রাণের ভয়েই ভাড়া চাইতে যাইনি আমরা। ক'দিন পরেই জানলাম আল-বদর নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠিত হয়েছে এবং সিলেটে এর অন্যতম প্রধান সংগঠক ও কমান্ডার মাওলানা আবু সায়ীদ। ভয়ে তখন পুরো পরিবার কম্পমান।'

জামায়াতে ইসলামিকে একট ইসলামি দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে ওরা। ইসলাম মানবতার ধর্ম, শান্তির ধর্ম। এই পবিত্র ধর্মকে ব্যবহার করে জামায়াতিরা প্রতারণা করছে মানুষের সঙ্গে। এই যে আবু সায়ীদ পরিবার নিয়ে বসবাস করার কথা বলে-একটি মারাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। ইসলাম ধর্ম কী ইহাকে সমর্থন করে? তার পর? একটি আবাসিক এলাকায় অনেকগুলো যুবক ছেলেকে তুলে দিয়েছে জোর করে। ভাড়ার শর্ত ভঙ্গ করে ব্যবহার করেছে অফিস হিসেবে। এলাকায় সৃষ্টি করেছে ত্রাস। তদুপরি ভাড়া দেয়নি একটাকাও। ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মইতো এগুলো এলাও করে না। অথচ এরাই নাকি ইসলামের ঠিকাদার। জামায়াতের নেতা-কর্মীরা এবং পুরো দলই এমন করে ইসলামকে ব্যবহার করেছে-নিজেদের স্বার্থে এবং করে যাচ্ছে এখনো। তাই যথার্থভাবেই একজন বলেন-'এটি হচ্ছে প্রতারণা জামায়াত স্টাইল।' এ ধরনের অসংখ্য ঘটনার জন্ম দিয়েছে জামায়াত। এর কিছু কিছু বর্ণনা থাকবে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতেও।

জোর করে ধর্মান্তর : এটা কোনো ধর্ম

'পাকিস্তান একটি ইসলামি রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে বসবাস করতে হলে মুসলমান হয়ে বাস করতে হবে। ইসলামের বিধি-বিধান মেনে, ফরজ আদায় করে জীবন যাপন করতে হবে। অন্যথায় এখানে বসবাস করা যাবে না। আর হিন্দু! এরাতো পাকিস্তানের শত্রু ভারতের চর। এরা অনৈসলামিক দল আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দেশদ্রোহী শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগত। সুতরাং হিন্দু পরিচয়ে নিয়ে এদেশে বসবাস করা যাবে না। তাদেরকে হয়তো শান্তির ধর্ম

ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এক একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে বাস করতে হবে। অথবা চলে যেতে হবে হিন্দুস্থান। এর কোনোটিই না করলে, তাদের জান-মালের নিরাপত্তা দেবে না সরকার বা প্রশাসন।

এসব বক্তব্য ছিল জামায়াতে ইসলামির জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতাদের। জোর করে তারা ধর্মান্তরিত করতে থাকেন বহু হিন্দুদের। যারা মানুষ হত্যা করে, নারী নির্যাতন করে, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে তাদের পক্ষে জোর করে ধর্মান্তরিত করাটা অস্বাভাবিক নয় মোটেই। কানাইঘাটে গবেষণার কাজ করতে গিয়ে সন্ধান পাই দু'টি গ্রামের। সে গ্রামগুলো আক্রান্ত হয়েছিল ধর্ম ব্যবসায়ী পাষণ্ড জামায়াতিদের দ্বারা। বাসিন্দাদের বাধ্য করে চিরকালের ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে ভিন্ন পরিচয় গ্রহণ করতে। জানা গেল জামায়াতের–সিলেট জেলা আমির মাওলানা শামসুল হকের নিজ এলাকা এটি। তার নিজের ইচ্ছেতেই স্থানীয় জামায়াত নেতারা হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে আক্রমণ চালায়। এ বিষয়ে অনেক তথ্যই পেয়েছি বিভিন্ন জনের কাছে। গিয়েছি ঐ গ্রামগুলোতেও। কিন্তু গ্রামবাসীরা একাত্তরের মতোই ভয় করেন জামায়াতে ইসলামিকে। বিশেষ করে জামায়াত তখন ক্ষমতার অংশীদার। জামায়াত নেতারা মন্ত্রী। সুতরাং একাত্তর নিয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করে না। বিষয়টি গোপন রাখতে চায় অতি সযতনে।

শিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজ উদ্দিন। বাস করেন সিলেট শহরে। ১৯৯৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, বের হই তার খোঁজে। সাথে সহ-গবেষক কয়সর আহমদ। সে-ই খুঁজে খুঁজে বের করে ঠিকানা। পাঠানটুলা এলাকায় অবস্থিত তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হই সকাল বেলাতেই। জানতে চাই পালজোড় ও ভাটিপাড়া গ্রামের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার কাহিনী। কথা বলতে রাজি হন তিনি। শুরুতেই নিজের ইউনিয়নকে অভিহিত করেন পাকিস্তানের চেয়েও বড় পাকিস্তান হিসেবে। কারণ, সিলেট জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির মাওলানা শামসুল হকের বাড়ি সেখানে। জামায়াতে ইসলমির অত্যাচার তখন ছিল আকাশ ছোঁয়া। বিশ্বের সকল বর্বরতাকে হার মানিয়েছে তারা-সে সময়।

সিরাজ উদ্দিন জানান, স্বাধীনতার পক্ষে তার অবস্থান। সে কারণে, জামায়াতে ইসলামির নেতারা তার উপর ছিল খড়গ্ হস্ত। ২৫ মার্চের পর ২৮ মার্চেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। জামায়াতের লোকেরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পাকি সেনাবাহিনীর কাছে। মুক্তিযোদ্ধা, হিন্দুস্থানের চর, পাকিস্তানের শত্রু ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে। তাকে হত্যা করার জন্যে প্ররোচিত করে স্থানীয় পাক সেনাধ্যক্ষকে। তারপর তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে সিরাজ উদ্দিনের বাড়িতে। কিন্তু তিনি যে বাড়িতে নেই! জামায়াতের স্থানীয় নেতাদের পরামর্শে ধরে নিয়ে যায় তার মাকে।

জামায়াত, শান্তি কমিটি এবং রাজাকার, আল বদর, আলশামস্ বাহিনীতে অমিত

ক্ষমতার অধিকারী তখন কানাইঘাট থানারই শামসুল হক, লুৎফুর রহমান, ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, আবু সায়ীদ এবং বিয়ানীবাজার থানার আব্দুর রাজ্জাক। এদের প্ররোচনায় এবং পরামর্শেই স্থানীয় জামায়াত নেতারা সমগ্র এলাকাকে পরিণত করে একটি নরককুণ্ডে। পালজোড় এবং ভাটিপুর গ্রামে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাস। শত অত্যাচার সত্ত্বেও দেশ ছাড়েননি ঐ দু'টি গ্রামের লোকেরা। আকড়ে থাকেন নিজ নিজ ভিটেমাটি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। বাসিন্দারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারতো। আর, তা না হওয়াতে ক্ষেপে আছে তারা গ্রামবাসীর উপর। তাই, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে নিয়ে যায় একটি বিকল্প প্রস্তাব। যা উল্লেখিত হয়েছে শুরতেই। গ্রামে থাকতে হলে, পাকিস্তানে বাস করতে চাইলে মুসলমান পরিচয়েই থাকতে হবে–অন্যথায় নয়। এ কাজে জেলা নেতাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন দর্জিমাটি গ্রামের শাহাব উদ্দিন এবং ঝিঙ্গাবাড়ির আব্দুর রইফ। জোর করে করে নেন তাদেরকে মুসলমান। প্রত্যেককে দেন তারা নতুন নাম। এ নামেই কাটাতে হয়েছে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সেখানেও দেশদ্রোহীদের তালিকা তৈরি করেন জামায়াত নেতারা। পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী, ইসলামের শত্রু এবং আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করে দশ কিংবা বারো জনের একটি তালিকা প্রণয়ন করে হস্তান্তর করেছিল পাক সেনাবাহিনীর কাছে। তালিকায় যাদের নাম ছিল তাদের মধ্যে আছেন ১. আব্দুর রহমান, ২. সামাদ উল্লাহ্ ৩. মাহমুদুর রহমান, ৪. আব্দুর রহমান, ৫. আনোয়ার হোসেন এবং ৬. সিরাজ উদ্দিন (তিনি নিজে)।

জেলা জামায়াত এবং ছাত্র শিবিরের নেতারা বিশেষ করে শামসুল হক, লুৎফুর রহমান, ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, আবু সায়ীদ এবং আব্দুর রাজ্জাকরা বহু জনসভায় বক্তৃতা করেছেন। স্বাধীনতার পক্ষের লোকজনদের তারা কাফের বলে অভিহিত করে এদেরকে খতম করার আহ্বান জানাতেন। এদের সহায় সম্পদকে গণিমতের মাল হিসেবে বর্ণনা করে লুটপাটকে জায়েজ বলে ফতোয়া জারি করতেন। এতে উৎসাহী হয়ে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা তা-ই করতো। তিনি বলেন, পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদার এবং মজাম্মিল আলীর বাড়ি লুটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল হাফেজ মাওলানা লুৎফুর রহমান। একদিন নৌকায় গিয়ে গাছবাড়ি বাজারে উঠেন লুৎফুর রহমান। সাথে তখন শফিকুল হক। সেখানেও এ রকম ফতোয়া গিয়েছিলেন। আর, সিলেট জেলা আল বদর বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী। দাপট তার আকাশচুম্বি। আর্মির গাড়িতেই চলা-ফেরা করতেন সে সময়। মনে হতো সাধারণ সৈন্যরা তার আদেশ নির্দেশ পালন করতো।

থানার পালজোড় গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দাদেরই জোর করে ধর্মান্তরিত করেছিল জামায়াত নেতারা। সেখানে বাস করতেন উপেন্দ্র কুমার দাস। তার এক মেয়ের উপর

দৃষ্টি পড়ে নর পিশাচ আফতাবুর রহমানের। আর যায় কোথা! ধরে নিয়ে যায় সে। এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানানোরও ক্ষমতা ছিল না কারো। আর, আফতাবরা তো এ ধরনের জঘন্য অপরাধ করেছে প্রতিদিনই। ভাটিপুরের এক ডাক্তারের মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে পাক সৈন্য এবং তাদের এদেশিয় পদলেহী দালাল জামায়াতিরা। এসব ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সিরাজ উদ্দিন বলেন-আবু সায়ীদ, ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী এবং আব্দুর রাজ্জাকদের মানবতা বিরোধী অসংখ্য অপরাধ কর্মের কথা স্মরণ হলে আজও শিউরে উঠেন।

আদায় করতো মুক্তিপণ

সিলেটের বিয়ানীবাজার থানায় কাজ করছিলাম আমি। থানা সদর লাগোয়া গ্রাম কসবা। গ্রামের ফকিরের গোষ্ঠী নামক পাড়ার পাল বাড়িতে বসে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি বেশ কিছু লোকের। গবেষণা সহযোগী হিসেবে সাথে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আলিম ফারুক। বাড়ির মালিক রফিক উদ্দিন। ইংল্যান্ড প্রবাসী তিনি। তার ছোট নাম তোতা মিয়া হিসেবেই চেনেন এলাকার লোকজন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নয়-বাংলায় জন্মগ্রহণকারি, বাংলা ভাষা-ভাষী জাতিদ্রোহী জামায়াত মুসলিম লীগের মানবতা এবং সকল ধর্মের পরিপন্থী গর্হিত কাজের বিরাট ফিরিস্তি তুলে ধরেন। বললেন, পাকিস্তানিরা-তাদের শাসন শোষণ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাঙালি জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হত্যা, নির্যাতন সবই করেছে। যা দুনিয়ার আর কোথাও সংঘটিত হয়নি। কিন্তু বাঙালি হয়ে যারা-বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে-তাদের সম্পর্কে ক্ষোভ তার সমধিক। অভিহিত করেন এদেরকে বেজন্মা হিসেবে। বললেন, সারা জাতি যখন মুক্তির লক্ষ্যে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত সে সময় জামায়াত এবং মুসলিম লীগের কিছু লোক নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের পা চেটেছে। আদেশ নির্দেশ পালন শুধু নয়-নিজেরাই যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত করেছে-নিজ উদ্যোগে।

পাকিস্তানি সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য বাঙালি ললনাদের জোর করে তুলে নিয়ে উপঢৌকন দিতো-ইসলামের নামাবলি পরা জামায়াতে ইসলামির নেতারা। কোনো গ্রামে কে আওয়ামী লীগের সমর্থক, কার ছেলে গিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে, কোনো স্থানে বাস করেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা-এ সব সংবাদ এই বশংবদরা পৌঁছে দিতো পাকিস্তানিদের কাছে। তারপর পথ প্রদর্শন করে করে পাক হায়েনাগুলোকে নিয়ে যেতো সে সব গ্রামে। দেখিয়ে দিতো তাদের ভাষায় দুষ্কৃতিকারীদের। এমন কি ধরিয়ে দিতো নিজেরাই। কোনো বাড়িতে কার ঘরে আছে সুন্দরী স্ত্রী বা কন্যা সে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে নিয়োজিত ছিল মহিলা সোর্স। ঐ কুখ্যাত মহিলাদের নাম পরিচয় তুলে ধরেন তিনি।

পুরো দেশের ন্যায়-তার নিজের গ্রামেও জামায়াত মুসলিম লীগের নেতারা

সংঘটিত করেছে এ রকম অসংখ্য ঘটনা। কিছু কিছু বর্ণনা দেবার কালে অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে তার চোখ। কিন্তু তার নিজের বা পরিবারের কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি? এই যে জামায়াত মুসলিম লীগের নেতাদের কুকর্মের কথা বলছেন–তাতে তিনি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কী না জানতে চাই আমি। রফিক উদ্দিনও পাল্টা প্রশ্ন করেন–একাত্তরের ৯ মাসে কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্থ্ হয়নি এমন পরিবার কি আছে বাংলাদেশে। ব্যতিক্রম ছিল পাক হানাদার বাহিনীর দালালরাই শুধু। তাদের ছিল কেবল প্রাপ্তিযোগ–আর প্রাপ্তিযোগ। বিয়ানীবাজারেও তাই।

এক সময় রফিক উদ্দিন ফিরলেন নিজের দিকে। শুরু করলেন কয়েকজন দালালের নাম নিয়ে। এর মধ্যে প্রধান হলেন–আব্দুর রহিম উরফে বচন হাজী। পাশের গ্রাম নবাবের বাড়ি। মুসলিম লীগ করতেন তিনি। একাত্তর সালে থানা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক এবং ক্যাপ্টেন ইফতেখার হোসেন গগুল কর্তৃক গঠিত মজলিসে সূরার সদস্য। শান্তি কমিটির প্রভাবশালী নেতা আব্দুল মালিক (দুদু মিয়া) মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতা। জামায়াত নেতা ইংল্যান্ড প্রবাসী আব্দুল হক কুটুমনা। সেও ছিল গগুলের মজলিশে সূরার সদস্য এবং এবং নারী সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত। মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য মজম্মিল আলী (কালা মিয়া) একদিন এরা সবাই এসে হাজির হয় রফিক উদ্দিনের বাড়িতে। জোর করে তুলে নিয়ে যার তার চাচা মসুদ আলীকে। বিয়ানীবাজার ডাক বাংলোয় থাকতো পাক বাহিনীর কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন গগুল। হাজির করা হয় তাকে–তার সামনে। কিন্তু কেন? ক্যাপ্টেনকে জানানো হলো রফিক উদ্দিনদের বসতবাড়ির বৈধ কাগজপত্র নেই। তারা বাস করছেন অবৈধভাবে। সুতরাং বাড়ি ছাড়তে হবে। শুধু কি তাই? বাড়ির সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি নিজেরাই নিয়ে জমা দিতে হবে ডাক বাংলোয়। এ রকম অবস্থায়ই হয়তো ব্যবহৃত হয়েছে মগের মুলুক শব্দটি। পরিবার পরিজন নিয়ে তা হলে কোথায় দাঁড়াবেন তারা। রাজি হননি মসুদ আলী। আর, সাথে সাথেই শাস্তিও নেমে আসে। ডাক বাংলোর রান্না ঘরের বরগার সাথে পা উপরে আর মাথা নিচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর চলে নির্যাতন। অন্যদিকে আল-বদর কমান্ডার আব্দুল হক কুটুমনা এবং শফিক আহমদ যায় আমার বাড়িতে। বলে, ১০ হাজার টাকা দিলে মুক্তি পেতে পারেন মসুদ আলী। অন্যথায় মৃত্যু তার অবধারিত। রফিক উদ্দিন নিজেই ১০ হাজার টাকা নিয়ে ছুটেন ডাক বাংলোয়। সেখানে তখন ক্যাপ্টেন গগুল এবং তার খয়ের খাঁরা। ক্যাপ্টেন গগুলের সামনেই তিনি গুনে গুনে ১০ হাজার টাকা তুলে দেন বচন হাজীর হাতে। তারপর বাড়ির কাগজ-পত্র তাদের হয়েছিল বৈধ। বাঁধন খুলে দেয়া হলো তার। মুক্তি পেলেন ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে। না, শুধু ১০ হাজার টাকা নয়। দিতে হয়েছে আরো ৭টি গরু এবং ৪ মণ চাল।

চাচাকে ছাড়িয়ে আনতে রফিক উদ্দিনের যখন প্রাণান্তকর অবস্থা–তখনই বাড়িতে আসে থানার ওসি। তুলে নিয়ে যায় তার মাকে। চাচাকে নিয়ে বাড়ি এসে দেখেন

মাকে নিয়ে গেছে থানায়। ছুটে যান আবার সেখানে। আরো আড়াই হাজার টাকা দিয়ে মুক্ত করেন মাকে। তারপর দাবি শেষ হয়নি। রাজাকারদের নানাভাবে খুশি করতে হয়েছে তার। রফিক উদ্দিন জানান, এভাবে মুক্তিপণ প্রদানের শিকার কেবল তিনি নন–আরো অনেকে হয়েছেন। তার চাচা এবং মাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনার সময় আরো অনেকেই ছিলৈন ডাক বাংলোয়।

বাউরবাগ গ্রামের বাসিন্দা ফৈয়াজ মিয়া। তার বাড়িতেই হাজির হয়েছিল এই পাষণ্ড দালালরা। নিয়ে যায় ফৈয়াজ মিয়াকে। সাথে তার স্ত্রী এবং পুত্র। এছাড়াও আরো অনেক নারী-পুরুষ। আটকে রাখে তাদেরকে কয়েকদিন ধরে। পরে টাকার বিনিময়ে এক এক করে মুক্তি দেয়। এ সময় আটক মহিলাদের উপর চালিয়েছে পাশবিক অত্যাচার।

কসবা গ্রামেরই এক মৌলানার বাড়িতে হানা দেয় জামায়াতের সশস্ত্র বাহিনী-রাজাকার। তুলে নিয়ে আসে তাকে এবং তার এক যুবতী কন্যাকে। না, পাকি সেনাবাহিনীর কাছে নেয়নি তাদেরকে। থানা বা রাজাকার ক্যাম্পেও না। কসবা গ্রামেরই নাদুর গোষ্ঠীর মক্তবে নিয়ে রাখে দু'জনকে। সেখান থেকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করে বিদায় দেয় মৌলানাকে। কিন্তু রেখে দেয় তার প্রিয়তমা কন্যাকে। শত অনুনয়-বিনয়- কিছুই কাজে আসেনি। কর্ণপাত করেনি পাক বাহিনীর সহযোগীরা। অবশেষে জোর করে সরিয়ে দেয় পিতাকে সেখান থেকে। আর মৌলানা সাহেব চলে যাবার পর অন্যান্য সব রাজাকার আল-বদরদেরও চলে যাবার নির্দেশ দেয় জামায়াতে ইসলামির নেতা ও আল-বদর কমান্ডার আব্দুল হক কুটুমনা। মক্তব ঘরেই রাত কাটায় অসহায় মেয়েটিকে নিয়ে। এ ঘটনাটি পরে নিশ্চিত করে রাজাকার মছদ্দর আলী মষট্টি। সে নিজেই গিয়েছিল ওদের তুলে আনতে। এ ব্যাপারে মষট্টির বক্তব্য তারা ছিল আব্দুল হক কুটুমনাদের অধীনে। তার আদেশ-নির্দেশ পালন করতে বাধ্য ছিল সব সময়। সেদিনও সে তা করেছে।

দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়া

১৯৯৪ সালের ১১ আগস্ট থেকে ওয়্যারক্রাইমস্ ফাইলের গবেষণা কর্ম শুরু। আর, '৯৫ সালের গোঁড়ার দিকে ভীষণ দ্রুত গতিতে চলছিল সে কাজ। আমাকে সাহায্য করার জন্যে ঢাকা থেকে আনা হয়েছে অনেককে। স্থানীয়ভাবেও ব্যবহার করছি যেখানে যাকে পাওয়া যায়। বিয়ানীবাজারের বড়দেশ গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালিক ফারুক। অনেক দিনের বন্ধু আমার। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রচুর সহায়তা দিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে নারী নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনা উদঘাটন এবং শান্তি কমিটির সদস্য ও আল-বদর রাজাকার কমান্ডারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ।

মনে পড়ে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকদিন ধরে অবস্থান করতে

হয় সেখানে। কমপ্লেক্সেই ছিল একটি রেস্ট হাউস। নির্বাহী কর্মকর্তার বদান্যতায় সেটি ব্যবহারেরও সুযোগ পেয়েছিলাম। আর সে সময় আব্দুল মালিক ফারুকও অবস্থান করতেন আমার সাথে। রেস্ট হাউসের দু'টি কক্ষই ব্যবহার করছিলাম আমরা। ১৭ ফেব্রুয়ারি ছিল আমার জন্যে একটি উত্তম দিন। সেদিন একজন রাজাকার কমান্ডারের সাক্ষাৎকার নিয়েছি কয়েকঘণ্টা ধরে। এতদিন যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের সমস্ত তথ্য উপাত্ত, যাচাই করা সম্ভব হয়েছে তার কাছে থেকে। তা ছাড়াও নারী নির্যাতন, সম্পত্তি দখল, মুক্তিপণ আদায় সংক্রান্ত লোমহর্ষক তথ্য পাওয়া যায়। এরপর একজন আল-বদর কমান্ডারের সাক্ষাৎও গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। ঐ আল-বদর বিয়ানীবাজার পি.এইচ.জি. উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং বিয়ানীবাজার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে ছাত্র সংঘের সক্রিয় নেতা ছিলেন। ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও ছাত্র সংঘের প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ছাত্র সংঘের নেতা বলেই আল-বদর বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ পান। আগের দিনই জামায়াতের এক সদস্য এবং থানা শান্তি কমিটির সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তিনি তারাবির নামাজ শেষে শুরু করে সেহেরির সময় পর্যন্ত একটানা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আমাকে। আর, এ সবগুলো কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আব্দুল মালিক ফারুকের নাম।

উপজেলা রেস্ট হাউস থেকে খুব একটা দূরে নয় এর বাড়ি। আছে তার মোটর বাইকও। সেটিতে করে বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে দশ বারো মিনিটের পথ। তারপরও বাড়ি যান না তিনি। আমাকে একা রেখে বাড়িতে যাবেন না। খেতে গেলে আমাকেও নিয়ে যান সাথে। ফিরেও আসেন আবার আমাকে নিয়েই। কিন্তু ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজাকার ও আল-বদরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষে যখন খেতে যাব তখন বললেন কথাটি। তার ছোট ভাই নূরুল ইসলাম মাস্তুক মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী। দু'তিন দিন হলো দেশে ফিরেছেন। কিন্তু দেখা হয়নি ভাইয়ের সঙ্গে। তাই বাড়ি যেতে চান তিনি। কষ্ট পেলাম আমি। আমার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ভাইকে দেখতেও যাননি। বললাম, তাৎক্ষণিক তাকে বাড়ি চলে যেতে হবে। আবার রাতে যেন না আসেন। তার দাবি আমাকেও যেতে হবে বাড়িতে। কিন্তু রাজি হইনি। কারণ আমি গেলে খাবার পরই চলে আসবেন আমার সঙ্গে। ফলে ছোট ভাইকে সময় দেয়া হবে না। তা হলে হোটেলে আমাকে খাইয়ে তারপর যেতে চান। বললাম আমি একা একাই খাব। তারপর অন্যান্য কাজ শেষ করে চলে যাবো রেস্ট হাউসে। আব্দুল মালিক ফারুক আমার নিরাপত্তা নিয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, সাংবাদিক আজিজুল ইসলাম পারভেজকে আমার সঙ্গে রেস্ট হাউসে রাত্রি যাপন করার প্রস্তাব দেন। পারভেজও (দৈনিক কালের কণ্ঠতে কর্মরত প্রথিতযশা সাংবাদিক) তা করতে রাজি। কিন্তু তাকে আর কষ্ট দিতে চাইনি আমি। তাছাড়া ওর সে রকম প্রস্তুতিও ছিল না।

যাই হোক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করি তাকে। রাতের খাবার গ্রহণ করি মকবুল হোটেলে। তারপর একা একাই চলে যাই গ্রামে। প্রতি রাতেই একবার করে যেতাম

তোফাজ্জল হোসেনের বাড়িতে। সমস্ত দিনের কর্ম, পরের দিনের কর্মসূচি ইত্যাদি অবহিত করতাম ডেভিড বার্গম্যানকে। জেনে নিতাম তার পরামর্শ। অন্যান্যরা যে-যেখানে কাজ করতো, তাদের সবার রিপোর্ট নিতাম এবং তাদের দিনের কাজের নির্দেশনাও দিতাম। ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধরে চলতো আমার ফোনালাপ। আর, বাড়িওয়ালা সে সুযোগ আমাকে দিতেন কোনো অর্থ গ্রহণ না করেই। সেদিনও গিয়েছি সে বাড়িতে। ফোনের কাজ সমাপ্ত করে ফিরি রাত ১২ টারও পরে। রেস্ট হাউসে ফিরতে বিলম্ব হলো আরো কিছুটা। কি জানি কেন বাজারে যেতে হয়েছিল একবার। ১টার দিকে ফিরে আসি রুমে। সাথে থাকা ছোট্ট ব্যাগটি পাশে রেখেই বসে পড়ি টেবিলে। ব্যাগ থেকে বের করি ডায়েরিখানা। দিনের সমস্ত কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করে নেই ডায়েরির পাতায়। তারপরও কাজ আছে আমার। পরের দিন কি কি কাজ কোথায় যাব–কাকে নিয়ে, কয়সরকে পাঠাবো কোথায়, মেহেদী আসলে কি কি কাজ করবে সে-সব কিছু চিন্তা করে লিপিবদ্ধ করে নেই। এসব করতে করতে চলে যায় ঘণ্টা খানেক সময়। বিছানায় যেতে হবে একবার। তা না হলে আগামী কাল কাজ করবো কেমন করে? এ সময়ই বাইরের গেটে ধাক্কা-ধাক্কি করছে কে। এত রাতে কে আসতে পারে? ফারুক ভাই? তা না হলে কে আসবে আবার। মনে পড়লো গেটে তালাও দেয়া হয়নি। তালাটি হাতে নিয়েই বেরিয়েছিলাম আমি।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। পরণে পাজামা পাঞ্জাবি। মাথায় টুপি। মুখ ভর্তি তার ছোট ছোট দাঁড়ি। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছে ছাত্র হতে পারে। কত হবে বয়স? রাতের বেলা ঠাহর করা বড়ই কঠিন। কণ্ঠস্বরে মনে হয়েছে ২০ থেকে ২৫ এর মধ্যে। কোনো ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করলো–এখানে কি তাজুল মোহাম্মদ আছেন?' ছেলেটিকে চিনি না আমি। জীবনে এখনো চেহারা দেখেছি কিংবা কণ্ঠ শুনেছি বলে তো মনে হয়নি। প্রশ্ন করার ধরণ দেখে-এ প্রতীতী জন্মে যে, সে-ও আমাকে চেনে না।

ততক্ষণে ছেলেটিকে না চিনলেও উদ্দেশ্য তার আঁচ করতে সমর্থ হয়েছি। পোশাক পরিচ্ছেদ এবং মুখের দাঁড়িতে প্রমাণ করে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন শিবিরের ক্যাডার। অন্যদিকে, বিগত ১৫ বছর ধরে জামায়াত এবং একাত্তরে জামায়াতের সশস্ত্র সংগঠন আল-বদর, আল-শামস্, রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটির যুদ্ধাপরাধমূলক কর্মকাণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছি। পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে জন সমক্ষেও প্রদর্শিত হচ্ছে। স্বাধীনতা বিরোধী এই দলের লোকজনদের থেকে হুমকি-ধামকিও এসেছে প্রচুর। সুতরাং রাতের শেষ প্রহরে এই বিশেষ ধরনের দাড়িওয়ালা, পাঞ্জাবী-পাজামা পরা ছেলে কেন আসতে পারে–তা তাকেই মাত্রা উপলব্ধি করা কঠিন বলে মনে করি না। তার সঙ্গীয় ছেলেটি বেশ দূরে অবস্থান করছে। মুহূর্তে মনে হলো আমাকে খুব ধৈর্যের সঙ্গ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতোই উত্তর দিলাম–উনিতো মিটিং করছেন। ওকে দেবো

নাকি? যুবকটি থতমত খেয়ে গেছে বলেই মনে হলো। কি করবে বা কি করা উচিত তা যেন ঠিক করতে পারছে না। পেছনে তাকালো অন্য যুবকের দিকে। কিন্তু সে তো বেশ দূরে। কথোপকথন শুনছে সবই। কিন্তু কথা বলছে না একটিও। প্রথম যুবক যেন অবাক হয়ে আবার প্রশ্ন করলো–'এখানে আরো লোক আছে? ঝটপট উত্তর দিলাম–এই পনেরো–না বিশ জন। আমার মনে হয় এখনই শেষ হবে মিটিং। একটু অপেক্ষা করুন। যুবক আর কোনো কথা বলেনি। একটু পেছনে সরে গেল সে। আর এখনই হাতে করে নিয়ে যাওয়া তালাটি ঝুলিয়ে দেই গেটে। দেখলাম বারান্দার পূর্ব পাশে একত্র হয়েছে দু'যুবক। কাঁঠাল তলার দিকে অন্য সিঁড়ি অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে তারা। সেখানে আরো কেউ কেউ আসতে পারে। হয়তো পরামর্শ করবে এখন তাদের সঙ্গে। যদি আবার ফিরে? তাহলে কি করবো আমি? কক্ষে প্রবেশ করেই বন্ধ করে দেই দরজা। পেছন দিকে আছে আরো একটি দ্বার–যা খোলা হয়নি কখনো। এই প্রথম খুললাম সে দরজা। ছোট সে ব্যাগটি হাতে নিয়েই পা দেই কার্নিশে। বিদ্যুতের তার রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কিন্তু কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই আমার। কার্নিশে ঝুলে ঝুলেই লাফিয়ে পড়ি নিচে। তারপর ভোঁ-দৌড়।

রাতের শেষ প্রহর তখন। দো-তলা থেকে লাফিয়ে পড়ার পর কোনো দিকে কোনো পথে দৌড়াচ্ছি বুঝতেই পারিনি। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে আবিষ্কার করি আমার অন্য এক বন্ধু তমাল সেনের বাড়ির কাছে। বিয়ানীবাজার পি.এইচ.জি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উদীচী বিয়ানীবাজার শাখার সভাপতি এবং কমিউনিস্ট পার্টিরও একজন সদস্য। ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো বন্ধু এবং সম্পর্কটা গড়িয়েছিল পারিবারিক পর্যায়ে। তা হলে কি সে বাড়িতে আশ্রয় নেবো? মুহূর্তে মনে হলো আমার বন্ধুর জন্যে তা হয়তো শুভ ফল বয়ে আনবে না। ওরা যদি আমাকে ফলো করে থাকে তা-হলে তমাল সেনের বাড়িও আক্রান্ত হতে পারে। অকারণে হেনস্থা হবে তারা। তাছাড়া তমাল সেনও তখন অবস্থান করছিলেন কোলকাতায় কিন্তু আমার আর চিন্তা-ভাবনার সময় নেই। ওর বাড়ির কাছে রাস্তার দু'পাশেই ছিল জঙ্গল। সেখানে ঢুকে পড়ি আমি। না, সম্ভবত ওরা দেখেনি আমার পলায়ন। কারণ যুবকদ্বয় ছিল উপজেলা কমপ্লেক্সের পূর্ব দিকে। আমি জাম্প দিয়েছি পশ্চিমে দিকে। দৌড়ে পালিয়েছিও পশ্চিম ও দক্ষিণমুখি। তারপরও বসে থাকি সে জঙ্গলের ভেতরে। প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম এভাবেই। ভোরে গাড়ি চলাচল শুরু হলে ধীরে ধীরে বের হয়ে বারইগ্রাম সিলেট সড়কের পাশে এসে অবস্থান নেই। তারপর প্রথম যে গাড়িটি সিলেট অভিমুখে আসছিল সেটিতেই উঠে পড়ি আমি। চলে আসি সিলেট শহরে। না, দু তিন ঘণ্টা বাসায় কাটিয়ে আবার রওয়ানা করি বিয়ানীবাজার।

যেতে যেতে মনে পড়ে ৫ মাস আগেকার একটি ঘটনা। আক্রান্ত হয়েছিলাম নিজ এলাকাতেই। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই সেদিনও।

১৯৯৪ সালের ১১ আগস্ট থেকেই শুরু করি যুদ্ধাপরাধীদের কয়েকজনকে নিয়ে

গবেষণা। কিন্তু আগে থেকেই অনেকগুলো কাজের সাথে যুক্ত ছিলাম আমি। বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। যুগ্ম-সম্পাদন এবং সম্পাদনা পরিষদের সদস্যই শুধু নয় পরিষদের গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়মিত অফিসও করতে হচ্ছিল। সারা দিন যুদ্ধাপরাধীদের খোঁজা খুঁজির পর বিকেলে ইতিহাস পরিষদের অফিসে আমাকে যেতেই হতো। ১২ সেপ্টেম্বরও বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম সকাল বেলা। সব কাজ শেষ করে বাসায় ফিরি রাত সাড়ে ৯টায়। কিন্তু বাসার পরিবেশ যেন থমথমে। কাপড় পাল্টে হাত-মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসার পরই স্ত্রী দিলেন সংবাদটি। কুলাউড়া থেকে ছোট ভাই ফোন করেছিল। আমার পিতার অবস্থা খুব খারাপ। শত বছরের ঊর্ধ্বে তার বয়স। অসুখ বিসুখ তেমন একটা ছিল না। কিন্তু গত তিন-চার বছর থেকে নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। হঠাৎ করেই খুব দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটছে তার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি আমি। বললাম, রাতেই বাড়ি যাব। কিন্তু কিভাবে? স্ত্রীর কথা হলো–সকালের তো কয়েকটি ট্রেন আছে। ট্রেনেই যাওয়া যাবে। না, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবো না আমি। চলে যেতে হবে রাতেই। রাত সাড়ে ১০ টায় একটা লোকাল ট্রেন আছে সেটিতেই রওয়ানা করতে চাই। স্ত্রীকে বললাম–সে যেতে চাইলে যেন সকালে আসে। আমি রাতেই যাবো। কিন্তু না–সেও যাবে আমার সঙ্গে। বেরিয়ে পড়ি তাৎক্ষণিক। আমাদের স্টেশন মেনুতে ট্রেনখানা পৌছায় রাত ১টার দিকে। তারপর সাড়ে ৩ মাইল রাস্তা যাবো কেমন করে?

তখন ছিল বাদলা দিন। সপ্তাহ কিংবা তারও বেশি দিন থেকে অনবরত ঝরছে বৃষ্টি। রেল স্টেশন থেকে আমাদের গ্রাম অবধি কাঁচা রাস্তাটি কর্দমাক্ত। রিকশা চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। হেটে যাওয়াও খুবই কষ্টকর। হাঁটু অবধি কাদা। স্টেশন মাস্টারের কাছে সাহায্য চাই আমি। উনি নিজেই একজন লোক ডেকে আনেন। যিনি যাবেন কটারকোনা বাজার পর্যন্ত। বললেন সেখান থেকে হয়তো কোনো লোক পাওয়া যাবে। লোকটি আমাদেরকে হারিকেনের আলোতে পৌছে দেয় সে বাজারে। সেখানকার একটি রেস্টুরেন্টের দরজা ছিল খোলা। মালিক ইলিয়াস আলী। তিনি আমাকে একটি টর্চ লাইট দিয়ে সহায়তা করেন। সেটি নিয়ে রওয়ানা করি আমরা। বাজারের পাশ দিয়েই বি. এস. এস. রোড। সেটি অতিক্রম করার সময় আমাদের টর্চের আলো দেখে–খুবই পাওয়ার ফুল একটি টর্চের আলো নিক্ষেপ করে কেউ একজন। সাথে সাথে শুনলাম কিছু লোকের কথাবার্তা। এর মধ্যে একজনের কণ্ঠই মাত্র চিনেছি।

এ গ্রামটি খুবই প্রতিক্রিয়াশীল। মুসলিম লীগ অধ্যুষিত ছিল স্বাধীনতার আগেই। মুক্তিযুদ্ধকালে ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহবায়ক ছিলেন গ্রামের এক লোক। তাছাড়া রাজাকার বাহিনীতে গিয়েছিল অনেকেই। বীর মুক্তিযোদ্ধা আরজু মিয়াকে ধরে পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে হস্তান্তর করেছিল এ গাঁয়েরই ক'জন দালাল। এদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছিল। স্বাধীনতার পরও তাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং

জামায়াতের প্রভাবও বেড়েছে। এখানেই আমার বিচার হয়েছিল একাত্তর সালে। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহবায়কের ছেলে এবং আরজু হত্যা মামলার আসামীর এক ভাইয়ের কণ্ঠ শুনেছিলাম স্পষ্টভাবে। সম্ভবত অন্তত পাওয়ারফুল টর্চ লাইটটি ছিল তারই হাতে।

উচ্চ কণ্ঠে আমার পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করি টর্চ বন্ধ করতে। তাই হলো–সাথে সাথেই। আমরাও চলছি পা টিপে টিপে। কটারকোনা গ্রামের প্রায় পশ্চিম প্রান্তে চলে এসেছি। রাস্তাটি উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে প্রায় ২৫ গজ পরেই আবার পশ্চিম মুখি চলে গেছে। এর আগেই একটি বাড়ি। সে বাড়িতে আবার আমার দু'জন সহ-পাঠী আছে। এ সময়েই শুনতে পাই ঐ লোকগুলোর কণ্ঠস্বর এবং সেই টর্চের আলো। দ্রুত দৌড়ে আসছে আমার দিকে। কি করবো আমি? ওরাতো একটি গ্রুপ। আমি একা কি করবো? তা ছাড়া আমার স্ত্রী তখন ভয়ে কাঁপছে। টর্চের আলো অনেক দূরে থেকেও নিক্ষিপ্ত হয়েছে আমাদের উপর। ওরাও বলে উঠে–ঐ যে যাচ্ছে। আমার যাবার রাস্তা এবং সহপাঠীদের বাড়ির রাস্তা ছিল সমান্তরাল। দ্রুত ওদের বাড়ির রাস্তা ধরি এবং প্রবেশ করি সে বাড়িতে। এদিকে লোকগুলো তা বুঝতে পারেনি। কারণ মূল সড়কটি এখানেই বাঁক নিয়েছে। ওদের পায়ের আওয়াজ এবং মুখের কথা সবই শুনছি আমি। ঐ বাড়ির পথ অতিক্রম করে চলে যাবার পর আমি ডাকতে শুরু করি–ভেলাই, ভেলাই (স্কুল জীবনে আমার সহ-পাঠী হেদায়েত উল্লাহর ছোট নাম ভেলাই) বলে। বেশ কিছুক্ষণ ডাকা-ডাকির পর সাড়া দিলেন তার ভাই ছয়েফ উল্লাহ্। পরিচয় দেবার পর দ্বার খুলে বাইরে আসলেন। বললেন ভেলাই বাড়িতে নেই। তাকে জানালাম–আমার সমস্যার কথা। ততক্ষণে অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আমার অন্য বন্ধু আলাউদ্দিন। সে সময়েই রাস্তা দিয়ে একই ডিরেকশনে যাচ্ছেন দু'জন লোক। তাদেরকেও ডেকে আনান তারা। আর, আলাউদ্দিনরা সবাই মিলে এগিয়ে দিয়ে যান আমায়। এভাবেই পৌঁছে যাই নিজ বাড়িতে।

পরের দিন দু'একজন বন্ধুকে বলেছিলাম কথাটা। অবাক হয়ে যান সবাই। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে অনেকেরই। কারণ, সেই কিশোর বয়স থেকেই এ কটারকোনার সাথে আমি সম্পর্কিত। এখানেই উচ্চ বিদ্যালয়ের লেখাপড়া সম্পন্ন করেছি। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটতো কটারকোনা এবং মনুকে কেন্দ্র করে। রাত-বিরাতে চলাফেরা করতে কোনো সমস্যাই বোধ করিনি। ছেলে বুড়ো সবাই চিনতো আমাকে। কেউ চিনতো ভালো ছাত্র হিসেবে, কেউবা ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসেবে। আবার বাবা-চাচা কিংবা পরিবারের নামেও জানতেন অন্তত বয়স্করা। ১৯৭০ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে চষে বেড়াতাম বাড়ি বাড়ি। সব মিলিয়ে লোকজনের সাথে গড়ে উঠে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা কাজ শুরু করার পর থেকে পাক বাহিনীর দালাল, শান্তি কমিটির সদস্য, রাজাকার, আল-বদর, জামায়াত-মুসলিম লীগের চক্ষুশূলে পরিণত হই। প্রকাশ পায় সিলেটে

গণহত্যা বই। এরপর থেকেই মারমুখি হয়ে ওঠে এরা। আর,সেদিন হয়তো সব কিছুরই শোধ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে রক্ষা পাই আমি।

সে দিনের পরই উপলব্ধি করি যে- এলাকা নয়, আত্মীয়-স্বজন কিছুই নয় রাজনৈতিক আদর্শই হচ্ছে জামায়াত-মুসলিম লীগ এবং যুদ্ধাপরাধীদের মূল ভিত্তি। সেটি আবার সংক্রমিত হচ্ছে বংশানুক্রমে। দালাল-রাজাকারদের সন্তানরা লাভ করছে ঠিক ওদেরই মানসিকতা। হত্যা, গুমের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিঃশেষ করার নীতি থেকে একটুও সরে যায়নি ওরা। তাই, সেদিন থেকে আর কখনো কটারকোনা বাজারে যাইনি আমি।

সিতাই বিবি সোনাভান বিবি : নারীজাতির কলঙ্ক

ফতেপুর বিয়ানীবাজার উপজেলা সদর সংলগ্ন একটি গ্রাম। সে গ্রামেরই এক মহিলা–সিতাই বিবি। জেলা, উপজেলা তো দূরের কথা ইউনিয়নেরই ক'জন জানতো তার নাম? নিজের গ্রামেও স্বনামে পরিচিতি ছিল না–১৯৭১ সালের আগে। কেনইবা চিনবে তাকে–মানুষ। একজন গৃহিণীকে ক'জন বা জানে। আশে পাশের লোকেরা কেউ বলতো হাছিব আলীর স্ত্রী, কেউ বলতেন শামসুদ্দিনের মা। এর বাইরে আর কোনোভাবে জানতো না কেউ তাকে। রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজকর্ম কোনো কিছুতেই এ নাম শুনেনি এলাকাবাসী। মানুষের সুখ-দুঃখেও সিতাই বিবি নামে কোনো মহিলাকে পাশে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়নি–কেউ কোনোদিন। তা হলে–এসব একজন মহিলাকে নিয়ে লেখার অবতারণা কেন?

১৯৮৪ সালে–প্রথম এ নামটি শুনি আমি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করতে ঘুরে বেড়াচ্ছি বিয়ানীবাজারের গ্রাম গ্রামান্তর। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য এবং তাদের এদেশিয় দোসর রাজাকার আল-বদরদের হাতে নিহত নিরীহ-নিরস্ত্র লোকের তালিকা করছি খুঁজে-খুঁজে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নির্যাতিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ সাধারণ মানুষের নামগুলোও তুলে আনছি একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মুক্তিযোদ্ধা এবং পাশাপাশি শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদরদের নামও সংগ্রহ করছি। বিয়ানীবাজার থানা শান্তি কমিটির তালিকায় পাওয়া যায় দু'জন মহিলার নাম। এরই একজন সিতাই বিবি। আশ্চর্য হয়ে যাই আমি। কারণ, এর আগে আর কোথাও শান্তি কমিটিতে মহিলা সদস্য পাইনি। মুক্তিযুদ্ধের মহিলা সংগঠক পেয়েছি প্রচুর। আছেন অনেক মুক্তিযোদ্ধাও। যুদ্ধ করছেন পুরুষ-যোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে হাত রেখে, বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধকর্ম সম্পন্ন করছে–একজন মহিলা!

বিয়ানীবাজার থানা সদরে নিয়োজিত পাক সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিল ক্যাপ্টেন ইফতেখার হোসেন গণ্ডল। শান্তি কমিটির সক্রিয় সদস্যদের নিয়ে সে গঠন করে থানা মজলিশে সূরা। আর সুরা সদস্যদের অন্যতম এই সিতাই বিবি। কুড়িজনের

মতো সদস্য নিয়ে গঠিত এ মজলিশে সূরার প্রত্যেক সদস্যের ছিল কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব। সিতাই বিবিও ব্যতিক্রম নন। তা হলে কি ছিল সিতাই বিবির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব চললো আমার অনুসন্ধান। জানা গেল পুরো থানা এলাকা জুড়ে কোথায়, কার ঘরে–সুন্দরী রমণী আছে সে সংবাদ সংগ্রহ করে পাক হানাদার অধিনায়ক ক্যাপ্টেন গণ্ডল কিংবা জামায়াত নেতা আব্দুল হক কুটুমনাকে (শান্তি কমিটি এবং মজলিশে সূরার প্রভাবশালী নেতা, শত শত নারীর সম্ভ্রম হরণকারী) পৌছে দিতে হবে। সিতাই বিবি সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছিলেন? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেননি। আবার উত্তরদাতাদের একেক জন দিয়েছেন একেক পরিসংখ্যান। প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছেন বহু নারী নির্যাতনের ঘটনা। সিতাই বিবি যেসব মহিলার সংবাদ সংগ্রহ করে পৌছে দিতেন নির্ধারিত স্থানে, তাদেরকে তুলে নিয়ে আসতো রাজাকাররা। এখনো কুটুমনা নিজেই যেতো অপারেশনে। কোনো কোনো স্থানে পাঠাতো তার অধিনস্থ রাজাকারদের। রাজাকার কমান্ডার শফিক আহমদ করতো কোনো কোনো অপারেশন। আর এদের সকলের হাতে কত বাঙালি রমণী শ্লীলতা হারিয়েছেন? কারো হাতেই কোনো পরিসংখ্যান নেই। মুক্তিযুদ্ধকালীন থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং থানা ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক আব্দুল আজিজ। পরিসংখ্যান দিতে পারেননি তিনিও। তবে জানিয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে শুধু বিয়ানীবাজার থেকে সাড়ে চার শ' নির্যাতিত মহিলাকে গোপনে চিকিৎসা করিয়েছেন তিনি। অনেকেই দিয়েছেন আরো বহু লোমহর্ষক তথ্য। কিন্তু সিতাই বিবি কোনো সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হননি কখনো। আশে-পাশের বাড়ির লোকদের দিয়েও চেষ্টা করিয়েছি। কিন্তু আমাকে সাক্ষাৎ দিতেও রাজি হননি মহিলা। তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি আমি। তিন যুদ্ধাপরাধী নিয়ে অনুসন্ধান চালানোর এক পর্যায়ে আমি সিতাই বিবির সাক্ষাৎ লাভের প্রচেষ্টা চালাই।

আমার একজন সহযোগীকে পাঠিয়ে সিতাই বিবির সঙ্গে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করি। এবারে উত্তর পেলাম ভিন্ন রকম। মহিলা জানিয়েছেন-'বয়স হয়েছে প্রচুর। বাইরে নানা কথা হয়। কিছু কিছু আমারও কানে আসে। অনেকে অনেক মিথ্যে তথ্য দিয়ে থাকেন। তাই, আমারও ইচ্ছে হয়–আসল সত্য তুলে ধরতে। কিন্তু আমার পরিবারবর্গ তা চায় না। এ বিষয়ে কারো সঙ্গে কোনো কথা বলি,-আমার ছেলে কখনো তা চাইবে না। কথা বলতে দিবেও না।'

সে সময়ের এক সন্ধ্যা রাতে ঠিকই পৌছে যাই সিতাই বিবির বাড়িতে। সাথে বিয়ানীবাজার থানারই বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালিক ফারুক। সম্ভবত সেদিন ছিল ১৯৯৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। বাড়িতে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চাই সিতাই বিবির সঙ্গে। কিন্তু বেরিয়ে আসলেন তার ছেলে শামসুদ্দিন। যাকে ডেকে দিতে বললেও তা করেননি। আলাপ করতে থাকেন তিনি নিজেই।

এই শামসুদ্দিনের কথাও জানি আমি। তিনি নিজেও ছিলেন থানা শান্তি কমিটির

সদস্য। বেশ কিছু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে আছে এই নাম। একাত্তরে তার নিজের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাই আমি। শুরুও করে দেন তাৎক্ষণিক। বললেন, ১৯৫৬ সাল থেকে বাস করতেন বাইরে। ভালো উর্দু জানতেন। যে কারণে পাকিস্তানি সৈন্যরা আদর করতো তাকে। তবে, একাত্তরের গোড়ায় অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। অস্ত্র চালনার কায়দা-কানুনও রপ্ত করেন। সে সময় তারা কয়েকজন মিলে বিয়ানীবাজার থানা থেকে ১[illegible]টি রাইফেল নিয়ে আসেন। এ অভিযানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ছিপ আলী, মইন হোসেন, আলাউদ্দিন ও আব্দুল নূর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ওরা সবাই চলে যান ভারতে। প্রশিক্ষণ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন যুদ্ধে। কিন্তু যাননি শামসুদ্দিন। পরে যোগ দেন থানা শান্তি কমিটিতে। নিজের কাছে রাখা রাইফেলটিও জমা দিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে। জানতে চাইলাম জহির আলী এবং আবুল হোসেন হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। তাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তিনি পাকিস্তানি আর্মি নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ আছে–স্মরণ করিয়ে দেই তাকে। তিনি সে অভিযোগ প্রত্যাখান করে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হবার অনেক আগে থেকেই তাহির আলীর সঙ্গে জমি-জমা নিয়ে তার মামলা-মোকদ্দমা ছিল। বাজারে যাবার একটি রাস্তা নিয়ে হাজী সিকান্দার আলীর সঙ্গে তাহির আলীর বিরোধ ছিল। সেই সিকান্দর আলীকে পাকিস্তানি সৈন্যদের দালাল আখ্যান দিয়ে তিনি জানান, সিকান্দার আলীই পাকিস্তানি আর্মি নিয়ে গেছেন তাহির আলীর বাড়িতে। এর আগেই তাহির আলী ও তার ছেলেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। আর, তাকে সমর্থন করেন থানা শান্তি কমিটির আহবায়ক আব্দুর রহিম (বচন হাজী), আব্দুর রকীব ও আব্দুল হক কুটুমনা। সিকান্দর আলীই মিলিটারি নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দিয়েছেন তাহির আলী এবং আবুল হোসেনকে। আমি জানালাম নিশ্চিতভাবেই জানি–তিনি নিজে গিয়েছেন পাক সেনাদের সঙ্গে।

প্রথমে অস্বীকার করলেও বার বার জোর দিয়ে বলাতে সুর পাল্টালেন তিনি। বলেন, বাজারে যাচ্ছিলেন সেদিন–তার কাজিন মাসুক উদ্দিনসহ। আর, সে সময় ডাক বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে হাজী সিকান্দর আলী আলাপ করছিলেন ৩ জন পাক সেনার সঙ্গে। তাকে দেখেই পাক সেনাদের জানান, আসামীদের বাড়ি শামসুদ্দিনের বাড়ির পাশে। তাই, ডেকে নেয় তাকে এবং পাক সৈন্যদের সাথে তাহির আলীর বাড়িতে যেতে বাধ্য করেছিল।

শামসুদ্দিন জানালেন–দশ-বারোজন পাকিস্তানি সৈন্যের সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন তাহির আলীর বাড়িতে। ধরে আনা হয় তাহির আলী ও আবুল সোবহানকে। বিয়ানীবাজার ডাক বাংলোয় তখন পাকিস্তানি সেনাদের সাথে বসা ছিলেন হাজী সিকান্দার আলী। সনাক্ত করে বললেন, এরাই আসামী। আর, সাথে সাথেই পাঠিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে বাধুরটিলা বধ্যভূমিতে। হত্যা করা হলো দু'জনকে তাৎক্ষণিক। কিছুক্ষণ পর সিকান্দার আলী আসেন–তার দোকানে। আর সিগারেট খেয়ে খেয়ে

আয়েস করে বল্লেন–শেষ করে এসেছেন কারবার। সিকান্দার আলীর ভাই সিদ্দেক আলীও তার দোকানে এসে গর্ব ভরে একই সংবাদ পরিবেশন করেছেন। এসব তথ্য দিয়ে তিনি বুঝাতে চান তাহির আলী, আবুল হোসেনকে হত্যার জন্যে দায়ী সিকান্দর আলী–তিনি নন। তা ছাড়াও বলেন, এ দু'জন লোককে ধরে আনার সময় ডাক বাংলোয় অন্য কয়েকজন বন্দি ছিলেন। দেখেছেন কসবার ছমির হাজীর স্ত্রী ও মেয়েকে। ছিল তুতু চৌকিদারও তাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আব্দুর রহিম বচন হাজী। আর দালালদের একজন ফুরকাস মাস্টারও খোশ মেজাজে বসা ছিলেন। জানালেন বিয়ানীবাজারে খুবই ক্ষতিকর দালাল ছিলেন দুদু মিয়া, জামিল বেদওয়ান (বোরকা হাজী), আব্দুর রহিম (বনে হাজী), হাজী সিকান্দার আলী, মতছিল আলী, জামাল মাস্টার, সুরকার মাস্টার ও মোক্তার আলী প্রমুখ। এভাবে অন্যদের কথা বলে গেলেও নিজেকে নির্দোষ, নিষ্পাপ বলে সাফাই গেয়ে যান।

শামসুদ্দিন এবং তার মা সিতাই বিবি দু'জনই শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। দু'জনই যুদ্ধাপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠনে যুক্ত হয়েছেন। ফলে, তাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের হয়েছিল। কারাগারেও পাঠাতেও হয়েছে তাদেরকে বহুদিন। এটাও কি অস্বীকার করবেন? না, অস্বীকার করতে পারেননি। বলেন, স্বাধীনতার পর তার বিরুদ্ধে দালাল আইনে মামলা হয়–এটা অস্বীকার করবেন না। তারপর গ্রেফতারও হয়েছিলেন। সিলেটের পুলিশ সুপার জবানবন্দি নিয়েছেন। হাজী সিকান্দার আলীও গ্রেফতার হন। তারা দু'জনই তাহির আলী এবং তার ছেলে আবুল হোসেন হত্যার জন্যে একে অন্যকে দায়ী করে জবানবন্দি দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে শামসুদ্দিনের বক্তব্য হাজী সিকান্দর আলী এ হত্যাকাণ্ডের দায় তার ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সত্য কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

শামসুদ্দিনকে জানালাম–আমি কথা বলতে চাই তার মায়ের সঙ্গে। তিনি তখন বলেন–তার মা কথা বলতে পারেন না। বয়স হয়েছে ১০০ বছরের উপরে। বাইরেও আসতে পারবেন না। তিনি শয্যাশায়ী। এ সময়ই বসার ঘরের দরজার আড়াল থেকে সিতাই বিবি সাড়া দেন। বললেন, 'আমি এখানে।' সাথে সাথেই উঠে গিয়ে মাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেন ভেতরে।

সিতাই বিবি সুস্থ। চলাফেরা করতে, কথা বলতে–কোনো সমস্যা নেই তার। আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। কথা বলতেও আগ্রহী। কথা বলতে পারলে হয়তো অনেক তথ্য পেতাম আমরা। কিন্তু তার ছেলে শামসুদ্দিন এ কাজে বাধার সৃষ্টি করেন। কোনো ভাবেই মায়ের সাথে আমাকে কথা বলতে দেবেন না। বললেন–যা কিছু জানার, তা তার নিকট থেকেই জানতে হবে। বললাম–আপনার মা একজন মহিলা হয়ে অন্য মহিলাদের সর্বনাশ করেছেন। পাক সৈন্যদের ভোগের সামগ্রী করেছেন। শামসুদ্দিন তা অস্বীকার করে চলেন। বলেন–এসব মিথ্যে। পূর্ব শত্রুতার কারণে কিছু লোক তাদের বিরুদ্ধে এসব কথা বলে বেড়ায়। কিন্তু এসব অভিযোগের

ভিত্তিতেই সিতাই বিবি গ্রেফতার হয়েছিলেন। কয়েক বছর ছিলেন কারাগারে। সেটিও কি মিথ্যে? প্রশ্ন করি তাকে। 'না মাকেও কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল–প্রায় তিন বছর। কিন্তু অভিযোগ সত্য নয়। তা হলে আপনার মায়ের সাথে কথা বলতে দিচ্ছেন না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তরে বার বারই বলেন-'মা ঠিক মতো কথা বলতে পারেন না। আপনার যা জানার আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি উত্তর দিবো।' এ সময়–তার মা আবার আসেন দরজায়। ছেলে ভেতরে যেতে বললে- মা যেতে চাননি। ফলে জোরে একটা ধমক দিয়ে ভেতের পাঠান। আমাকেও চলে যেতে বলেন। কিন্তু আমার যে আরো কিছু জানার ছিল। শামসুদ্দিন এবারে রেগে যায়- 'অনেক হয়েছে ভাই। এবার আসেন।' উনার সাথে একটু দেখা করে যাই–

'না। দেখুন–আমি ভালো মানুষ। তাই, ভালো ব্যবহার করছি। দয়া করে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবেন না।' উনাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। বললাম–আপনি একটু বসেন। আরো কিছুক্ষণ কথা বলি। এবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে শামসুদ্দিন বললেন, 'আপনাদের সাথে বোধকরি আর ভালো ব্যবহার করতে পারবো না। এ মুহূর্তেই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কড়া আদেশ তার। অন্ধকার রাত। পরিচিত কোনো লোকও নেই। যদি আক্রমণ করে বসে। তা হলে আমরা কি করবো? তার চেয়ে চলে আসাই শ্রেয়।

সিতাই বিবির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। কিন্তু তার ছেলে তো কিছুক্ষণ অবস্থান করার সুযোগ দিয়েছিলেন। নিজেকে এবং মাকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সোনাভান বিবির ছেলে তো, তাও করেননি। পরিস্থিতি গড়িয়েছিল খুবই অপ্রীতিকর পর্যায়ে। হয়তো খারাপ অবস্থায় চলে যেতো। তাই চলে এসেছিলাম বাড়ি থেকে।

সোনাভান বিবির বাড়িও বিয়ানীবাজার থানায়। লাউতা ইউনিয়নের জলঢুপ গ্রামেই বসতি। বিয়ানীবাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছোটখাটো কি একটা চাকুরি করতেন। একাত্তরে সেই সোনাভান বিবিও নিজ হাত রেখেছিলেন পাকিস্তানি জল্লাদ বাহিনীর সদস্যদের হাতে। বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং শান্তি কমিটিরও সদস্য পদ গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর ক্যাপ্টেন গগুল যখন অধিনায়ক হিসেবে বিয়ানীবাজারে কর্মরত–তখন তার জিপেও চড়েছেন। ক্যাপ্টেন গগুলের পাশে বসে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন যারা তাদের অনেকের সে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন আমায়। বর্ণনা দাতাদের মধ্যে সম্ভবত সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন ফরিদ আহমদ নানু। বিয়ানীবাজার পি.এইচ. জি. উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন। দূর থেকে দেখলেও সোনাভান বিবিকে চিনতে তার কষ্ট হয়নি। কারণ, পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দা এবং পূর্ব পরিচয়ের সূত্র থেকেই সনাক্ত করা তার পক্ষে ছিল সহজ। তাই, আমি আব্দুল মালিক ফারুককে নিয়ে উঠি জলঢুপ এলাকার আড়িয়াবহর গ্রামে–ফরিদ আহমদ নানুর বাড়িতে। নিয়ে গেলেন তিনি সোনাভান বিবির বাড়িতে। ফরিদ আহমদ

নানু মহিলার পরিচিত হওয়াতে সুবিধে হয়েছিল। সাড়া দিলেন তার আহ্বানে। আহ্বান জানান তার বৈঠকখানায়। একথা-সেকথার পরই জানালাম আমার পরিচয়। জানাতে চাই একাত্তরে তার ভূমিকা সম্পর্কে।

সোনাভান বিবি। নামটি সেকেলে। কিন্তু কথা-বার্তায় তা নন। কথার পিঠে কথা যোগ করে করে সত্যকে আড়াল করার কলাকৌশল জানা আছে ভালোই। সোনাভান বিবির বয়স তখন ৫৬ বছর। তা হলে একাত্তরে কত ছিল। নিজেই বলে দিলেন ৩৬ বছর। প্রশ্ন করেছিলাম শান্তি কমিটিতে তার কি কাজ ছিল এবং সে কাজের অভিজ্ঞতা-ই বা কি? সোনভান বিবি অস্বীকার করেন শান্তি কমিটিতে থাকার কথা। তবে, ক্যাপ্টেন গগুলের কাছে যেতেন বলে নিজে থেকেই বলেন। ক্যাপ্টেন গগুল ছিল একজন চরিত্রহীন লম্পট। শত শত নারীর ইজ্জত হরণ করেছে সে। তারপরও কেন তিনি তার গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াতেন? 'না, না ওর গাড়িতে করে যাইনি। গিয়েছিলাম-'ডাক বাংলোতে।' সেখানেই তো বাস করতো গগুল। এত খারাপ একটি লোক–তার উপর হানাদার সৈন্য বাহিনীর স্থানীয় অধিনায়ক। একা একা তার বাসস্থানে যেতে আপনার ভয় করেনি? উত্তরে সোনাভান বিবি বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা দেখার খুব সখ ছিল আমার। সেদিন শুনলাম মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়েছে এবং ডাক বাংলোতে নিয়ে রাখা হয়েছে। তাই, আমি গিয়েছিলাম মুক্তি দেখতে।' ঠিক সে সময় ডাক বাংলোতে আর কোনো কোনো দালাল উপস্থিত ছিলেন জানতে চাই। বললেন ছিলেন কেউ কেউ। তবে, নাম মনে নেই। ক্যাপ্টেন গগুলের জিপে চড়ে কোথায় কোথায় যেতেন বা গিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আবারো বলেন, জিপে চড়েননি–তবে গগুলের বাসস্থান ডাক বাংলোতে গিয়েছেন আরো কয়েকবার। এ সময়ই ফরিদ আহমদ নানু বলে উঠেন, 'আমি নিজেই তো আপনাকে দেখেছি–গগুলের সঙ্গে জিপে চড়ে ঘুরতে। আরো অনেকে দেখেছেন। এখন আপনি অস্বীকার করছেন কিভাবে? তাৎক্ষণিক উত্তর সোনাভানের 'থানা শান্তি কমিটির আহবায়ক আব্দুর রহিম বচন হাজী এবং সদস্য ফারুক আহমদ চৌধুরী, সজিব উদ্দিন, দুদু মিয়া ও আব্দুল হক কুটুমনা বাড়ি দখল করতে চায়। তারা বলে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে। অন্যথায় জোর করে আমাকে পাঠিয়ে দেবে ভারতে। এর মধ্যেই একদিন এসে হাজির হয় বচন হাজী, জামায়াতের দুদু মিয়া ও কিন্তি বাবু। ঘর ভেঙ্গে দেয় আমার। তখন বিচার প্রার্থনা করতে আমি যাই ক্যাপ্টেন গগুলের কাছে।

শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন সিতাই বিবি এবং সোনাভান বিবি। নিশ্চিত তথ্য রয়েছে এ বিষয়ে। এলাকাবাসীরা তা নিশ্চিত করেছে। তাছাড়াও থানা শান্তি কমিটিতে সোনাভান বিবির সহকর্মীদের মধ্যে যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া সম্ভব হয়েছে–তারা উল্লেখ করেছেন এই সোনাভানের নাম। থানা শান্তি কমিটির সদস্য মৌলানা ছমিরউদ্দিন যাদেরকে সক্রিয় সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে সিতাই বিবি এবং সোনাভান বিবির নাম ছিল। শান্তি কমিটির অপর সদস্য এবং রাজাকার

কমান্ডার মছদ্দর আলী মষত্তি প্রদত্ত তালিকায়ও রয়েছে তার নাম। এমন কি আল বদর কমান্ডার আবুল কালাম আজাদ প্রদত্ত সাক্ষাৎকারেও এসেছে।

সোনাভান বিবির দাবি–তিনি পাকিস্তানিদের দালাল ছিলেন না। কারো কোনো ক্ষতি করেননি। শান্তি কমিটিতেও নাম ছিল না। তা হলে দেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথেই পালাতে গেলেন কেন? কেন আত্মগোপনে যেতে হলো আপনাকে। আর দালাল আইনে গ্রেফতারই বা হলেন কেন? কারগারে আটক ছিলেন না? আপনার বিরুদ্ধে মামলা হয়নি? বললেন, 'মামলা হয়েছিল। জেলেও কাটাতে হয়েছে প্রায় দেড় বছর। কিন্তু সব অভিযোগ তো সত্য নয়। শত্রুতা করেছে কেউ কেউ।' তবে কে শত্রু ছিল, কেন ছিল তা উল্লেখ করেননি। তাছাড়া প্রসঙ্গ পাল্টে দেন তাড়াতাড়ি। তিনি বলতে থাকেন অঞ্জলি বিশ্বাসের কথা। সোনাভানের মতে লড়াই বিশ্বাসের পুরো পরিবারকে ডেকে নিয়ে যায় ক্যাপ্টেন। অঞ্জলিকে সে মুসলমান করে। তারপর বিয়ে হয় গণ্ডলের সঙ্গে। পরে বিয়ে করে কুটুমনা এবং সুপাতলায় থাকতো তাকে নিয়ে। আসলে বিয়ে কোনো বিষয় নয়–ক্যাপ্টেন গণ্ডল এবং কুটুমনা মিলে ভোগ করতো তাকে। জানতে চাই জ্যোৎস্না এবং কল্পনাকে কারা ধরে এনেছিল? এ দু'হতভাগীকে তুলে আনার নির্দেশইবা কে দিয়েছিল। সোনাভানের উত্তরও ঝটপট, 'না, ওদেরকে বিয়ানীবাজার আনা হয়নি আর বলতে পারেনি তিনি। কোথা হতে ঝড়ের বেগে এসে প্রবেশ করেন তার বড় ছেলে সফর উদ্দিন শুকুর। উচ্চ স্বরে চিৎকার করে নির্দেশ দেন মাকে, 'বন্ধ করো মুখ। একদম চুপ হয়ে যাও। অন্যথায় খুব খারাপ হবে আজ।' মাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান ভেতরে। হতভম্ব হয়ে যাই আমরা। কিছূই বুঝতে পারছি না। তাছাড়া ছেলেগুলোকেও আমি চিনি না। তারা যে মা ছেলে সেটা বুঝতে বেশ সময় লেগেছে।

জোর করে সোনাভান বিবিকে নিয়ে যান ভেতরে। সেই ঝড়ের গতিতেই আবার আসলেন বসার ঘরে। এবারে তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু আমরা। কর্কশ ভাষায় প্রশ্ন ছুঁড়লেন-'এ বাড়ির মালিক আমি। আমার অনুমতি না নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন কেন? বিনা অনুমতিতে একজন মেয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা–খুবই অন্যায় কাজ। এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। বলুন কে আপনাদেরকে এ অনুমতি দিয়েছে। এ ধরনের অনধিকার চর্চার ফল দেখাবো এখনই।' বললাম, আমরা আপনার মায়ের কাছে এসেছি। উনিই তো অনুমতি দিয়েছেন। ওঃ মা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে এলেন, 'তিনি মেয়ে মানুষ। উনার সঙ্গে কথা বলাটাই বিরাট অন্যায়। উনি অনুমতি দেবার কে?'

ভেতর থেকে ভেসে আসলো সোনাভান বিবির কণ্ঠ'-'আমিই ওনাদেরকে আসতে অনুমতি দিয়েছি। আমার ইচ্ছাতেই কথা বলছি। উনাদের বসতে দাও। আমি চা নিয়ে আসছি।' আবার খেলেন তিনি ধমক'-'চুপ করে। বলছি না–মুখ বন্ধ করে থাকতে।' লোকটি তাৎক্ষণিক তার বাড়ি ত্যাগ করতে হুকুম করেন আমাদেরকে। কিন্তু

সোনাভান বিবির আগমন প্রত্যাশায় অপেক্ষমান আমরা। তাতে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে গর্জে উঠেন তিনি। হয়তো হাত তুলবেন আমাদের উপর। ফরিদ আহমদ নাঁনু তখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। লাফ দিয়ে উঠলেন তিনি। উত্তর দিতে শুরু করেন তার প্রতিটি কথার। দেখে নেবারও হুমকি দেন এক পর্যায়ে। তাতে ফলও হয় কিছুটা। নরম হয়ে আসে সোনাভান পুত্র সফর উদ্দিন শুকুরের স্বর। বলতে থাকেন ২৪ বছর আগে কোথায় কি ঘটেছিল তা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন? তাছাড়া কি আর কোনো সমস্যা নেই? কাজ নেই আপনাদের। বুঝলাম অপেক্ষা করে লাভ হবে না। তাছাড়া যে কোনো মুহূর্তে অপ্রীতিকর কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। তার চেয়ে বিদায় নেয়াই শ্রেয়।

সোনাভান বিবি সম্পর্কে এর পরে আরো কিছু তথ্য উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। জানা যায়, ১৯৬৫ সালের আগেই তার স্বামী ফিরোজ আলী মারা যান। কিছুদিন পরে শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। এলাকায় স্থাপিত হয়েছিল পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প। সে ক্যাম্পে রান্না করতেন সোনাভান বিবি। আর, এখন থেকেই পাক সৈন্যদের সাথে গড়ে উঠে সম্পর্ক। সে সম্পর্ক ধরেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্তি। শান্তি কমিটিতেও অন্তর্ভুক্তি। আবার, অন্যান্য দালালরা তার বাড়ি দখল করতে চেয়েছিলেন বলে যে তথ্য দিয়েছেন সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলে পাওয়া যায় আরো কিছু তথ্য। সোনাভান বিবি যে বাড়িতে বাস করেন–সেটি ছিল এক হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি ওরা ভারতে চলে গেলে এটি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু সোনাভান বিবিরা সে বাড়িটি ভোগ দখল করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সোনাভান বিবিরই সহকর্মী অন্যান্য দালালেরা তাকে উচ্ছেদ করে সে বাড়িটি নিজেদের দখলে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সোনাভান বিবি সে সময় নিজেও ক্যাপ্টেন গণ্ডলের খুব কাছের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাই, তাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। জানা যায় এখন পর্যন্ত এ বাড়ি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে সরকারের মালিকানাতেই রয়েছে। সোনাভান বিবিরা এখনো দালান উঠাতে পারেননি। যদিও তার ছেলে সফর উদ্দিন এখন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে খুবই প্রভাবশালী।

এসব ভিন্ন বিষয়। একাত্তরে সিতাই বিবি এবং সোনাভান বিবি জাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাদের সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য এবং জামায়াতের দালালরা সারা থানা জুড়ে চালিয়েছিল নারী নির্যাতন। অসংখ্য মা-বোনের উপর তাদের প্ররোচনাতে চালিয়েছিল পৈশাচিক নির্যাতন। তাই, এই সিতাই বিবি এবং সোনাভান বিবি নারী জাতির কলঙ্ক হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

নারী নির্যাতনের ঘটনা : খুঁজতেও মানা

লোকলজ্জার ভয় তাদের। সামাজিকতাও নাকি দায়ী। তাই, নারী নির্যাতনের ঘটনা ধামা-চাপা দিতে চান সবাই। মুখ খুলে বলতে চান না কেউ। সামনেও আসেন না

নির্যাতিতরা। সেটি যেমন গ্রামে–তেমনি শহরেও ঘটেছে। অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ বা শ্রমিক থেকে শুরু করে শহুরে উচ্চবিত্ত পরিবারেরও পার্থক্য নেই এ ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পর নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে যারা কাজ করেছেন–তাদের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে প্রচুর। এমন এক মহিলা সৈয়দা জেবুন্নেছা হক। কতজন নির্যাতিত মহিলাকে তারা সেবা দিয়েছেন, ওরা এখন কে কোথায় আছে–জানতে চাই তার কাছে। কিন্তু তিনি ঐ মহিলাদের পরিচয় প্রকাশ করতে নারাজ। অনেক পীড়াপীড়ির পর বললেন–তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করার সময় একটা শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। আর, তা ছিল–নির্যাতিত মহিলার পরিচয় বাইরে প্রকাশ না করা। সে কারণে, এখনো তিনি তা খোঁজ করে চলেছেন। বলতে চাননি আমাদের কাছে।

সৈয়দা জেবুন্নেছা হক এক সাথে তুলে ধরেন অনেকগুলো উদাহরণ যেমন–পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের ব্যাংকার থেকে তুলে এনেছিলেন এক মহিলাকে। চিকিৎসাও করিয়েছেন তাকে। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ্য হবার আগেই পালিয়ে যান সে মহিলা। আর, কখনো আসেননি সামনে। কোথায় গিয়েছিলেন কেমন আছেন কিছুই জানতেন না তিনি। বছর বিশেক পরে হঠাৎ করেই দেখতে পান তাকে–একটি সামাজিক অনষ্ঠানে। কিন্তু কথা বলতে পারেননি। মহিলা জেবুন্নেছা হককে দেখা মাত্রই অনুষ্ঠান থেকে চলে যান। এ রকম আরো কিছু উদাহরণ তুলে ধরে–এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন।

শুধু সৈয়দা জেবুন্নেছা হক (সাংসদ, আওয়ামী লীগ নেত্রী) নন। অন্যরাও এ বিষয়ে কথা বলতে চাননি। অভিজাত পরিবারের সদস্য আবিদা চৌধুরী। সিলেট শহরে নারী নির্যাতনের বিষয়ে আমার কাছে মুখ খুলেননি কখনো। নানাভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি আমি। অবশেষে তার কাছে পাঠিয়েছিলাম সাংবাদিক, লেখক, চিত্র নির্মাতা শামীম আকতারকে। তিনিও এসেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের তথ্য সংগ্রহ কাজে। ৭ ফেব্রুয়ারি রাতে ফোন করে আবেদা চৌধুরীকে জানালাম–'দৈনিক সংবাদ' এর মহিলা পাতার সম্পাদক শামীম আকতার সিলেটে। তিনি দেখা করতে চান তার সঙ্গে। রাজি হলেন তিনি। সাথে সাথেই পৌঁছে দেই তাকে। একথা-সেকথার পর শামীম আখতার মুক্তিযুদ্ধকালে সিলেটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন সম্পর্ক জানতে চান। সে সময় আমি ছিলাম না সেখানে। তবে, নাম প্রকাশ না করে অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি।

স্বনামধন্য সাংবাদিক আমিনুর রশীদ চৌধুরীও নির্যাতিত হয়েছিলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে। আবাসিক স্কুলে আটকে রেখে চারমাস ধরে চালিয়েছিল শারীরিক নির্যাতন। এ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখাও আছে আমিনুর রশীদ চৌধুরীর। যা পাঠ করলে যে কারো শরীর শিউরে উঠবে। গৃহবন্দি ছিলেন তার স্ত্রী ফাহমিদা রশীদ চৌধুরী। তিনি নিজেও সে সম্পর্কে কোনো কথা বলতে চাননি। উনার

ছেলে হেরাস্ত রশীদ চৌধুরীর অনুরোধেও মুখ খোলেননি। সেখানেও নিয়ে যাই শামীম আকতারকে কিন্তু উদ্ধার করতে পারেননি তিনি কিছুই।

পাক সেনাবাহিনীর আরেক লম্পট অফিসার ছিল ক্যাপ্টেন বাশার। শহরে তার আস্তানা খুঁজতে গিয়ে পেয়েছিলাম অসংখ্য নারী নির্যাতন ঘটনা। কিন্তু কেউ-ই তা প্রকাশ করতে চান না। শহরের কালিঘাট এলাকার একটি বাড়িতে পাঠিয়েছিলাম শামীম আকতারকে। সেখানে হয়েছে ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা।

গজেন্দ্র লাল মিত্র ছিলেন ব্যবসায়ী। একাত্তরে হয়তো কৌশলগত কারণে সখ্যতা গড়ে তোলেন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে। বাড়িতে নিয়ে যান একদিন। চা-নাস্তা দিয়ে আপ্যায়নও করেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ সেই পাক হায়নারা হাত বাড়ায় তার স্ত্রী ও কন্যার প্রতি। বাধা দিলে বুলেটের শিকার হন গজেন্দ্র মিত্র। আর, স্ত্রী হয়ে পড়েন অপ্রকৃতিস্থ। কথা বলতে চেয়েছি আমি অনেকবারই। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি। অবশেষে শামীম আকতার তাদের সাক্ষাৎকার নিতে গেলে গজেন্দ্র মিত্রের ছেলেরা ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করেন–এই সাংবাদিকের উপর। শামীম আখতার সেদিন কোনো রকমে চলে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমার জীবনেও এখন ঘটনা ঘটেছে নানা স্থানে। সর্বশেষ ঘটনা বোধ করি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানায়। সে থানার দাসেরবাজার গ্রামে রয়েছে একটি বাজার। পুরো এলাকাটিই এখন দাসেরবাজার এলাকা নামে পরিচিত। নানকার আন্দোলনকালে–সেখানেও দোলা লেগেছিল। সংগঠিত হয়েছে দুর্বার আন্দোলন। এই দাসেরবাজার এলাকায়ই একটি গ্রাম গোবিন্দপুর। সেখানে পৌছাই দু'বন্ধু আব্দুল মালিক ফারুক এবং ফরিদ আহমদ নানুসহ। লক্ষ্য আমাদের মহেন্দ্র দাসদের বাড়ি।

প্রথমত গ্রামটি খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয়েছে। ঠিক কোনো গ্রামে এই দাস পরিবারের বসবাস–তা জানতেই ছুটতে হয়েছিল বিয়ানীবাজার থানার মাথিউরা গ্রামে। অনেক লোককে জিজ্ঞেস করে করে শেষ পর্যন্ত জানলাম ওরা বাস করে গোবিন্দপুরে। সেখানে পৌছে বাড়িটিও সনাক্ত করি স্থানীয়দের সহায়তায়। মহেন্দ্র দাস, নরেন্দ্র দাস, দেবেন্দ্র দাস এবং অজয় দাসরা ছিলেন বিয়ানীবাজার থানার মাথিউরা ইউনিয়নের বাসিন্দা। একাত্তরের সেই ভয়াবহ দিনেও গ্রাম ছাড়েননি তারা। দালাল রাজাকারদের শত হুমকি ধামকি সত্ত্বেও ভিটেমাটি আকড়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু একদিন অস্ত্রধারি কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে বাড়িতে। এদের গায়ের রং বাদামি নয়–মোটেই। মুখে বাংলা বুলি–উর্দুতে কথাও বলতে পারে না একেবারেই। পিতা-মাতা সবাই ছিল বাঙালি। অথচ বাংলাদেশে এবং বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের আদেশ নির্দেশ পালনে ব্যস্ত। হত্যা, গুম, ব্যভিচার সবই সংঘটিত করে চলেছে সমানে। সেই জাতিদ্রোহী লোকগুলো জামায়াতে ইসলামি দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত রাজাকার বাহিনীর সদস্য। তাদের কাছে খবর ছিল–দাশ বাড়িতে রয়েছে যুবতী মেয়ে। তারা চায়–সেই রমণীদের। পাকিস্তান এবং

ইসলাম রক্ষার নামে নাকি তাদের জেহাদ। আর, সেই জেহাদকালে খুন-নারী-ধর্ষণ সবই জায়েজ। এ ফতোয়া দিতেন জামায়াত নেতারা তাই জামায়াতের আধা সামরিক বাহিনী রাজাকারও সে জায়েজ কাজগুলি সংঘটিত করেছে দেশ্যব্যাপী।

জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এই রাজাকাররা তুলে আনে মহেন্দ্র দাসের মেয়ে জ্যোৎস্না এবং নরেন্দ্র দাসের মেয়ে কল্পনাকে। গ্রামের অদূরেই হাওরে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে পাশবিক নির্যাতন চালায় তাদের উপর। ক্ষত-বিক্ষত করে তাদের দেহ। ক্ষোভে, হতাশায় জর্জরিত পুরো পরিবার। লজ্জা নাকি তাদেরকে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেধে ফেলে। তাই চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি ত্যাগ করে চলে যান তারা-গোবিন্দপুর গ্রামে।

বাড়িতে ছিলেন চার ভাই-ই। কিন্তু আমাদেরকে সহযোগিতা দিতে চাননি। এড়িয়ে চলছিলেন প্রথম থেকেই। কারা এই অপরাধ সংঘটিত করেছিল তাদেরকে গ্রামের লোকজন দেখেছেন। বলেছেনও কেউ কেউ। আবার, থানা শান্তি কমিটির সদস্য হাজী ছমির উদ্দিন এবং রাজাকার কমান্ডার মনছুর আলীও ঐ রাজাকারদের নাম প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নির্যাতিতা জ্যোৎস্না-কল্পনার পিতা-কাকারা প্রকাশ করবেন না কিছুই। মুখে তাদের কলুপ। ঐ নামগুলো তাদের মুখ থেকে বেরুবে না সেটা কি ঘৃণা? মনে হলো না। তবে, কারণ সম্ভবত একটি প্রথমত প্রাণের ভয় তাদেরও যায়নি। বরং তখন ছিল বেশি। যারা দেশব্যাপী এই পাপাচার সংগঠিত করেছে তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-জামায়াত তখন খুবই সংহত, সুসংগঠিত এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশিদার। এর আগের দেড় দশক ধরে জামায়াত এবং এর ছাত্র সংগঠন শিবির বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে হত্যা আর নির্যাতনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত করেছে তা-তাদের অজানা নয়। তাই বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে হলেও লুকিয়ে রাখতে চান-তাদের কষ্টের কথা। সীমাহীন লাঞ্ছনার গাথা। এক ভাই সামনে আসলেই অন্য ভাই চলে যান দূরে। তাকে ডাকতে যান এক ভাই। তারপর আর ফিরে আসেননি কেউ-ই। এভাবেই যাত্রা মঞ্চস্থ করতে থাকেন দাস ভাইয়েরা।

অনেকক্ষণ চললো আমাদের চেষ্টা-তদবির। অবশেষে এক ভাই দাস বসলেন-আমাদের সামনে। জানতে চাই তার মেয়ে এবং ভাতিজিকে কোনো কোনো রাজাকার তুলে নিয়েছিল। না, নাম উচ্চারণ করলেন না তিনি। বললেন, বাড়ি থেকে একদিন তার মেয়ে কল্পনা এবং ভাতিজি জ্যোৎস্নাকে তুলে নিয়ে যান। পরে হাওরে ছেড়ে দেয় তাদেরকে। কোনো ভাবেই এর বেশি কিছু জানাতে রাজি হননি। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করার অনুরোধ জানান তিনি। এক পর্যায়ে ক্ষেপে উঠে ভাইয়েরা। বললেন, আর একটি কথাও বলবেন না তারা। আমরা চলে আসতে পারি। হ্যাঁ চলেই আসি আমরা। পারিবারিকভাবে জানানো হয়নি কোনো তথ্য। সহযোগিতাও করতে রাজি হননি তারা। এখানে শেষ হয়নি। আমার সাথে দুর্ব্যবহারও করেছেন। আমাদের ঘূণেধরা সামাজিক অবস্থার কারণে নারী নির্যাতনের কোনো তথ্য কেউ প্রকাশ করেন

না। করতে চান না। আবার এ কাজে যারা নিয়োজিত তাদের বিরুদ্ধেও খড়্গ্ হস্ত হন-নির্যাতিতরাও।

সত্যি কথা হলো- সেদিন আমার সাথে দু'জন বন্ধু ও একটি মোটর-বাইক থাকাতে শারীরিকভাবে নাজেহাল করতে সাহস করেননি। তাছাড়া এলাকার কিছু প্রভাবশালী লোকের নামও উচ্চারণ করেছিলাম কথার প্রসঙ্গে। তাদের কেউ ছিলেন সহপাঠী–কেউবা রাজনৈতিক সহকর্মী। আমার যে কোনো সমস্যাও ওরা চলে আসতে পারেন। হয়তো এসব বিবেচনা করেই তারা বেশি দূর আগাননি। এ সবই হচ্ছে আমাদের সামাজিকতার ফসল। লোকলজ্জা, সমাজের ভয় ইত্যাদি থেকেই এ অবস্থান নেন নির্যাতিতরা।

নির্যাতনের হাত থেকে অসহায় বাসীদের রক্ষা করার শক্তি, সাহস কোনোটাই সেদিন হয়তো ছিল না কারুরই। অথচ আজ এই মা-বোনদেরকে দেখা হয় অবহেলার চোখে। সমাজ কোথায় তাদেরকে সম্মান দেবে, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে–উল্টো হেয় করে চলেছে। সে কারণে অনেক মা, অনেক বোন ক্ষোভে-দুঃখে, হতাশায় হারিয়ে গেছেন। আত্মহননের পথ বেঁছে নিয়েছেন বহু রমণী। কেউ কেউ আত্মগোপন করে বেঁচে আছেন আজও। এই যে, বাতাসিয়া রুহিদাস–তার শেষ পরিণতি সম্পর্কেও জানে না কেউ। কোথা গেল সে, বেঁচেছিল না আত্মবিসর্জন দিয়েছে–তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বাতিসিয়া রুহিদাস সিলেট শহর সংলগ্ন হাদিসনগর চা বাগানের শ্রমিক। সেই চা বাগানে একাত্তরের ১৯ এপ্রিল প্রবেশ করে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা। প্রথম পর্যায়ে হত্যা করে ৪০ জন শ্রমিককে। তারপর বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে হাড্ডিসার মহিলা শ্রমিকদের পাকড়াও করে হায়েনাগুলো। অকুস্থলেই নির্যাতন করে সবাইকে। এর মধ্যে একজন বাতাসিয়া রুহিদাস। স্বাধীনতার পর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ জানে না তার সন্ধান। লোক লজ্জার ভয়েই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন এই মহিলা।

কমলগঞ্জ থানার শমশের নগরের একটি ঘটনা। সেখানকার মহিরতুল আম্বিয়া নামক এক নির্যাতিত মহিলার স্বামী তো উকিল নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। আমরা অবশ্যি এই উকিল নোটিশের কোনো জবাব দেইনি। পরে তিনি আর মামলা করতেও যায়নি। কারণ, এলাকায় গিয়ে জানতে পারলেন–মামলা করলে শমসের নগরের বিশিষ্ট লোকেরা সাক্ষ্য দেবেন। তাতে বেরিয়ে আসবে আরো অনেক কাহিনী।

আর, সুনাগঞ্জ জেলার ছাতক। সেখানেও নির্যাতিত হয়েছেন অগুনতি মা-বোন। এখন অতি সম্মানিত মহিলা স্বাধীনতার পর এক দালালের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। হাজত হয়েছিল তার। কিন্তু সেই দালালই আবার গবেষণাকালে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন আমায়। ব্যর্থ হন তিনি অনিবার্যভাবেই। অবশেষে আমার লেখার প্রতিবাদ করেন ভিন্ন নামে, অন্য পরিচয়ে। কয়েকবার তা করার পর আমি তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরার সুর দিলে ক্ষান্ত হন তিনি।

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানাধীন হাতুণ্ডা গ্রামে ছিল যামিনী মোহনদের বাড়ি। তার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করতো-হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা। স্বাধীনতার পর সে মহিলাকে আর পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান করে জানা যায়-লোক লজ্জার ভয়ে তিনি দেশত্যাগ করেছেন। এভাবেই অনেকে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। আত্মগোপন করেছেন। তারপরও কোনো তথ্য প্রকাশ করতে রাজি নন। বলবেন না কিছুই। অনুসন্ধান করাটাও ওর জন্যে ক্ষতিকর। ওরা চায় না-কেউ এ বিষয়ে খোঁজাখুঁজি করুক। তাতে সামাজিকভাবে আরো হেয় হবেন তারা যে কারণে এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে নিষেধ করেন অনেকেই।

চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি

ডেভিড বার্গম্যান তখন ঢাকায়। আমি সিলেটে। টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশন থেকে এসেছেন আরো অনেকে। কোলকাতা থেকে আনা হয়েছে ক্যামেরাম্যান রঞ্জন পালিতকে। আর অন্যান্য কলাকৌশলী আসছেন লন্ডন থেকেই। গীতা সায়হাল আছেন ঢাকাতেই। ১১ ফেব্রুয়ারি আমায় ডেকে পাঠন সেখানে। পরের দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে একটি জরুরি সভা। বিকেলেই পৌঁছলাম ঢাকা। কিন্তু এর আগেই ফোন করে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন ডেভিড। সিলেটে ফোন করে আমার স্ত্রীর নিকট থেকে জেনে নিয়েছেন-কখন রওয়ানা হয়েছি এবং কখন ঢাকা পৌঁছতে পারি।

সন্ধ্যার পর পরই সভাস্থলে পৌঁছাই আমি। সাথে কয়সর আহমদ শুরু হলো সভা। সিদ্ধান্ত হলো ফেব্রুয়ারি মাসের ৩য় সপ্তাহ থেকে শুরু হবে আমাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ। ৬ মাস ধরে আমাকে কাজের ফলাফল অর্থাৎ যাদের সাক্ষাৎকার ফিল্মে সংযুক্ত করার প্রয়োজন তাদের সাক্ষাৎকার ধারণ করা হবে। এর জন্যে সময়ও নির্ধারিত হলো কোনো প্রয়োজনে বা কারণে পরিবর্তিত না হলে ২২ ফেব্রুয়ারি শুরু করে ২৬ ফেব্রুয়ারিতেই শেষ করবো এ কাজ। কর্মসূচি শুরু করবো আমরা কানাইঘাট দিয়ে। ২৩ তারিখ যাব চারখাই এবং দীঘিরপাড়। ২৪ তারিখ সিলেট শহর এবং কানাইঘাটের অসমাপ্ত ফিল্মিং। ২৫ ফেব্রুয়ারি সিলেট শহরে এবং পরের দিন সেখানে যেখানে সমাপ্ত হয়নি-সে কাজগুলো করা।

সভায় এ সিদ্ধান্তগুলো চূড়ান্ত করতেই বেশ রাত হয়ে যায়। তার পর সিদ্ধান্ত হলো-পরের দিন আমরা আবার সভায় মিলিত হবো। আমার জন্যে নির্ধারিত বাসস্থান ছিল হোটেল হোয়াইট হাউসে। সাথে কয়সর আহমদ। কিন্তু সব শেষ করে সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন মধ্যরাত অতিবাহিত হয়ে গেছে।

পরের দিন ১৩ ফেব্রুয়ারি। সকালেই যোগাযোগ করতে শুরু করি মুঈদ চৌধুরী, তবারক হোসেইন প্রমুখদের সঙ্গে। সংগ্রহ করি কিছু তথ্য, কিছু পরামর্শ। তারপর আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক নূরুল ইসলাম নাহিদ (সাংসদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, শিক্ষা মন্ত্রী)। মনিসিংহ-ফরহাদ

স্মৃতি ট্রাস্টে দেখা করি তাঁর সঙ্গে জানতে চান আমাদের প্রজেক্ট। হ্যাঁ, যতটুকু বলা সম্ভব ততটুকুই বলেছি এবং কিছু পরামর্শও নিয়েছি। পরে গিয়েছিলেন সিলেটে। সেখানও দেখা হয়েছে এবং অতি সংক্ষেপে দিয়েছেন তাঁর মূল্যবান মতামত।

বিকেল ৪টায় আবার সভা। এবারে ২২ ফেব্রুয়ারির আগে পর্যন্ত আমার কাজের একটা তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে ছিল–

১. বিয়ানীবাজার থানার গোবিন্দ শ্রী গ্রামে নারী নির্যাতনের ঘটনা উদ্ঘাটন করা। সেখানে কারা পাকিস্তানি আর্মি নিয়ে যায়। অজয় পুরকারস্থের বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিল কে কে, কারাইবা দিয়েছিল অনিশা এবং সীমার সন্ধান। তাদের রাজনৈতিক পরিচিতিও বের করতে হবে।

২. জলঢুপ হাইতি গ্রামের লড়াই বিশ্বাসের মেয়ে অঞ্জলি বিশ্বাসকে কোনো কোনো দালাল-রাজাকার ধরে নিয়েছিল। কোথায় রাখে, কে বিয়ে করে। কারা মুসলমান করে এবং শেষ পরিণতিই- কি হয়েছিল। যারা এ জঘন্য পাপাচার সংগঠিত করেছে তাদের নাম পরিচয় ইত্যাদি।

৩. মাথিউরা গ্রামের জ্যোৎস্না ও কল্পনাকে তুলে নিয়ে যারা ধর্ষণ করেছে সে রাজাকারদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

৪. কানাইঘাটের মালিগ্রামে কত তারিখ গণহত্যা করেছিল পাক হানাদার বাহিনী? কোনো কোনো রাজাকার পাকিস্তানিদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে যায় সেখানে। তাদের পরিচয়ও তুলে ধরতে হবে।

৫. বিয়ানীবাজারের সুপাতলা গ্রামে যে নারকীয় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল সে জন্যে দায়ী কারা? কুটুমনার নির্দেশে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল না শফিক আহমেদের। ঘোষ বাড়িটি কে দখল করেছিল তাও বের করতে হবে।

৬. হত্যা এবং নারী নির্যাতনের এ ঘটনাগুলোর সঙ্গে আবু সায়ীদ এবং লুৎফুর রহমানের বা অন্য কোনো জামায়াত নেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কে ছিল কী না?

৭. এছাড়াও অন্যান্য তথ্যগুলো চূড়ান্তভাবে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে।

রাত ১২টা পর্যন্ত এ সভা চলে আমাদের। এর মধ্যে সমাপ্ত হয় নৈশ খাবারও। সে সময় উপস্থিত ছিলেন রুচির যোশী (প্রযোজক গীতা সায়হালের স্বামী এবং লেখক ও শর্ট ফিল্ম নির্মাতা)। তিনি আমার নিরাপত্তা নিয়ে ছিলেন সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন। বার বার জানতে চান এ বিষয়ে। কিন্তু সে সময় এসব বিষয়ে চিন্তা করার কোনো অবকাশ ছিল না আমার। কাজের যে চাপ–তাতে অন্য কোনো ভাবনা মাথায় ঢুকার সুযোগ নেই। তাছাড়া দ্রুত কাজ সমাপ্ত করতে না পারলে সমস্যা হতেই পারে। তাই নিজের বিষয়ে নয়–আমার ভাবনা ছিল পুরো প্রজেক্ট নিয়েই। রাত ১২টায় সভা শেষ করে যখন হোটেলে ফিরি তখন আমি ক্লান্ত। অন্যদিকে ভোরেই রওয়ানা করার কথা মিলে পারাবত ট্রেনের রিজার্ভেশনও করা হয়েছে।

আমরা যখন সভা করছি তখন দেশে চলছে ৯৬ ঘণ্টা হরতাল এবং রেল ও সড়ক

অবরোধ। পাট ও বস্ত্রকল শ্রমিকরা ঘোড়াশালে রেল লাইন উপচে ফেলেছে। ফলে, ঢাকা-ভৈরববাজার লাইনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রেল যোগাযোগ। ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে যথারীতি রেল স্টেশনে পৌঁছে জানলাম–আমাদের ট্রেনখানা টঙ্গি, জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ, গৌরীপুর, কিশোরগঞ্জ, ভৈরববাজার হয়ে যাবে সিলেটে। মন্দ হয়নি। ট্রেনে চড়েই বিছানা পেতে দিলাম লম্বা ঘুম। ময়মনসিংহ পর্যন্ত বলা যায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়েছি। তারপর দেড় দশক আগেকার স্মৃতি বিজরিত অনেকগুলো স্থান দেখে দেখে পার করে দেই সন্ধ্যা অবধি।

১৫ ফেব্রুয়ারি আবার রওয়ানা করি বিয়ানীবাজার। সংগ্রহ করি আব্দুল মালিক ফারুককে। শুরু হয় সাক্ষাৎকার গ্রহণ। ঐ রাতেই রফিকউদ্দিন তোতা মিয়া এবং এর পর মঈনুল হোসেনের সাক্ষাৎকার নেই–গভীর রাতে মঈনুল হোসেনের বাড়ি ফতেপুর গ্রামে। পিতা তাহির আলী। তাদের বাড়িতে একদিন পাকিস্তানি সৈন্যরা গিয়ে হাজির হয়। এর পেছনে ছিল হাজী আব্দুর রহিম উরফে বচন হাজী, সিকান্দর আলী, সিতাই বিবি ও শামসুদ্দিনের প্ররোচনা। এরাই পথ প্রদর্শন করে পাকিস্তানিদের নিয়ে যায়। সনাক্ত করে তাহির আলী এবং তার পুত্র আবুল হোসেনকে। নিয়ে যায় তাদেরকে ক্যাপ্টেন মণ্ডলের অবস্থান স্থলে। তারপর তারই সামনে এই দালালরা আবার সনাক্ত করেছে তাদেরকে। সাথে সাথেই আসে হত্যা করার নির্দেশ। কাল বিলম্ব না করে অদূরের রাধুরাটিলায় (বর্তমানে শহীদ টিলা) নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় তাদেরকে। স্বাধীনতার পর মঈনুল হোসেনের ভাই আলতাফ হোসেন বাদি হয়ে দায়ী দালালদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ মামলার কারণেই আলতাফ হোসেনকে হত্যা করা হয়েছিল নির্দয়ভাবে। আলতাফ হোসেন হত্যার জন্যে মঈনুল হোসেনই বাদি হয়ে মামলা করেছিলেন আব্দুর রহিম বচন হাজী এবং মজম্মিল আলীকে (কালা মিয়া) আসামী করে।

মঈনুল হোসেন জানান, তাদের গ্রামেই বুলু মিয়ার বাড়ি। একদিন তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় জামায়াতের সশস্ত্র সংগঠন রাজাকাররা। ধরে নিয়ে আসে বুলুর স্ত্রী এবং বোনকে। ডাক বাংলোয় আটক রাখে তাদের। তিনদিন ধরে। থানা শান্তি কমিটির সদস্য সিতাই বিবি-ই তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। মজলিশে সূরায় সিতাই বিবির দায়িত্ব হিসেবেই একাজ করেছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। অন্যদিকে বুলু মিয়ার এক ভাই ছিল রাজাকার। তিনদিন পর সে এসে হাজির হয় ডাক বাংলোয়। মুক্ত করে নিজের বোন ও ভাইয়ের স্ত্রীকে। ঐদিনই তাদের এলাকার ৮০ জন লোককে ধরে আনে নিজ নিজ বাড়ি থেকে। তারপর পি.এইচ.জি. স্কুলের ফুটবল মাঠে নির্যাতন চালায় তাদের উপর দিনব্যাপী।

মঈনুল হোসেন আরো জানান, বিয়ানীবাজার থানা শান্তি কমিটিতে ছিল জামায়াতে ইসলামের প্রাধান্য। হত্যা,নারী নির্যাতন, বাড়ি-ঘর ও জমি দখল, অগ্নি

সংযোগ, লুটপাট ইত্যাদি কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতো এই জামায়াতের সদস্যরাই। নিজেরাই বাস্তবায়ন করতো এ পরিকল্পনা। এ পর্যায়ে জামায়াত দলীয় অতি ক্ষতিকর শান্তি কমিটির সদস্যদের কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেন। তার মতে এদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল হেকিম তাপাদার, আব্দুল খালিক, জামিল রেদওয়ান (বোরখা হাজী), সোলেমান হোসেন খান, আব্দুল হক-কুটুমনা, সাদউদ্দিন, তৈমুছ আলী, আব্দুর রাজ্জাক, আহমদ হোসেন খান, সফিউর রহমান (টুনু মিয়া) প্রমুখ। চললো আরো আলোচনা। বেরিয়ে আসে আরো অনেক কথা। কিন্তু বেশি সময় তো দিতে পারবো না। দ্রুত কাজ সমাপ্ত করতে হবে। যেতে হবে আরো অনেক জায়গায়। এভাবেই যেন শুরু হলো আমাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ।

শেষভাগে যুক্ত হয়েছেন অনেকে

ইংল্যান্ডের টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশনের পক্ষে যুদ্ধাপরাধীদের খোঁজে বেড়াচ্ছি- প্রায় সাড়ে ৬ মাস ধরে। ১১ আগস্ট কাজ শুরু করার পর ৫ মাস পর্যন্ত একাই করে চলেছি সে কাজ নিজের মতো করে। অবশ্যি প্রতিটি কাজের ব্যাপারে অবহিত করতাম ডেভিড বার্গম্যানকে। পরামর্শ নিতাম তার। আর অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতাম তাকে সময় সময়। বাংলাদেশে তার অবস্থান কালে তো প্রতিদিনই কথা বলতাম। জানুয়ারি থেকে তিনি নিজেই বেশি বেশি সময় অবস্থান করতে থাকেন সিলেটে। আর, এ সময়ে প্রতিটি কাজের পরিকল্পনা তিনি-ই করতেন। সাক্ষাৎকারগুলো নিতাম দু'জন মিলেই। এক সময় কাজ বেড়ে যায়। তখন ডেভিডই যুক্ত করেন কয়সর আহমদকে। তাতে কাজের গতিও বাড়ে। তারপর ঢাকা থেকে নিয়ে আনা হয় সাংবাদিক সেলিম ওমরাহ্ খান এবং মেহেদী হাসানকে। আরো পরে আসলেন শামীম আকতার।

বিগত ৫/৬ মাস ধরে সিলেট জেলা এবং মৌলভীবাজার জেলার কোনো কোনো স্থানে গবেষণা কাজ করার ফলে যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের মূল রাজনৈতিক দল জামায়াত কিছুটা হলেও আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়। নানাভাবে খোঁজ খবর নিতে থাকে ওরা। এক পর্যায়ে আমাকে হুমকি-ধামকিও দিতে থাকে। পত্রিকা অফিসে চিঠি দিয়ে হুমকি দিয়েছে নানা নামে। বাসার ঠিকানায়ও গিয়েছে অনেকগুলো চিঠি। এছাড়াও বাসায় গিয়ে খোঁজা-খুঁজি করেছে আমায়। না পেয়ে গালমন্দ করেছে প্রচুর। তখনই ত্বরিৎ কাজটা গুছিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়। বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় করতে হয় আমার সোর্সগুলোকে।

কানাইঘাটে আনিসুল আলম এবং তার সঙ্গে কাজ করে আরো অনেকে আর, তাকে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেন শিক্ষক নূরুল আম্বিয়া চৌধুরী প্রয়োজনে সহায়তা দিতেন ডা. ফয়জুল হক এবং জমির উদ্দিন প্রধান। তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন এলাকার সমন্বয় সাধনটা করেছে কয়সর আহমদ। চারখাই, গাছবাড়ি,

ঝিঙ্গাবাড়ি, গদারবাজার প্রভৃতি স্থানে ছুটাছুটি করে-করে আহরণ করেছে প্রচুর উপাত্ত। আমিও গিয়েছি বারে বারে। ২৯ জানুয়ারি ডেভিড বার্গম্যানকে নিয়ে যাই চারখাই। আবার পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারের বাড়ি। কথা বলি ফাতির আলী তাপাদারের সঙ্গে। এর আগেকার সাক্ষাৎকারে দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে নতুন যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে কথা বলতেই তাদের সঙ্গে দেখা করা। শফিক উদ্দিন কাজলকেও পেয়ে যাই সেখানে। তারপর মুসলে উদ্দিন আহমদের সঙ্গে চলে যাই লাংলাকোনা গ্রামে। সেখানে সাক্ষাৎকার নিয়েছি অনেক লোকের। আর, চারখাই ফিরে আসার পর সাক্ষাৎকার দেন কামরুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম, সুরমান আলীসহ আরো অনেকে।

সিলেট জেলা মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এডভোকেট আব্দুল হাফিজ। তাকেও হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা চারখাইয়ের দোহাল গ্রামে। সে বাড়িতেও যাই আমরা। প্রত্যক্ষ করি সে স্থানটি যেখানে হত্যা করা হয়েছিল এডভোকেট আব্দুল হাফিজকে। সেখানেই এ বিষয়ে সাক্ষাৎকার দেন চারখাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হাছিব কিনু মিয়া। এভাবে ঘুরে বেড়াই আমরা রাত ৮টা পর্যন্ত। তথ্য উপাত্তও পেয়েছি প্রচুর।

পরের দিন আবার রওয়ানা করি আমরা কানাইঘাট। যাবার পথে বিষ্ণুপুরের গণহত্যার নেপথ্য বহু তথ্য জানতে পারি বড়চতুল গ্রামে বসে। সেখানে উপস্থিত লোকজনদের মতে জামায়াতের জেলা পর্যায়ের নেতা লুৎফুর রহমান এবং আল বদর কমান্ডার আবু সায়ীদ ও ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীরসহ অন্যান্যরা প্রায়ই যেতেন কানাইঘাট এবং থানার অন্যান্য স্থানে। সভা করে করে বলতেন যারা নৌকায় ভোট দিয়েছে, আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে, পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে–তারা সবাই ইসলামের শত্রু। তারা কাফের। ইসলাম এবং ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের স্বার্থে তাদেরকে কতল করতে হবে। আর, যুদ্ধকালে শত্রুদের হত্যা করা, নারী ভোগ সবই জায়েজ। এসব বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে স্থানীয় জামায়াত কর্মীরা এবং জামায়াত গঠিত ও পরিচালিত রাজাকার বাহিনী। এই রাজাকাররাই পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে আসে শালীগ্রাম ও বিষ্ণুপুরে। ১৯ আগস্ট তারা হত্যা করে ৩৮ জন গ্রামবাসীকে। আহত হয়েছেন অনেকে। বহু মা-বোন হয়েছেন নির্যাতিত রাজাকার বাহিনীর কমান্ডারদের নামও তারা প্রকাশ করেন এবং জানান তাদের গ্রামে পাক সেনাদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে এসেছিল আমীর আলী, মফিজ আলী, আব্দুল মালিক, আমজাদ আলী ও বশির আহমদ নামক রাজাকাররা। এছাড়াও পাকিস্তানিদের সাথে ছিলেন স্থানীয় জামায়াত নেতারা।

এই যে হত্যা, নারী ধর্ষণ এবং অন্যান্য অপরাধকর্মের সঙ্গে সব জায়গাতেই রাজাকার-আল-বদর বাহিনীর নাম আসছে–সেসব রাজাকার আল-বদরের মুখ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করতে হবে। চলে গেলাম কানাইঘাট বাজারে। ডা. ফয়জুল হকের

ফার্মেসিতে বসেই চিন্তা-ভাবনা করতে থাকি আমরা। অবশেষে জানালাম তা ডা. ফয়জুল হককে। তার পরামর্শ মতোই একটি রিকশা পাঠালাম আওয়ামী লীগের থানা সম্পাদক জমির উদ্দিন প্রধানের বাড়িতে। সালাম জানালাম তাকে। চলেও আসেন তাৎক্ষণিক। প্রাথমিক কথা-বার্তার পরই জানালাম আমাদের ইচ্ছের কথা। আর, সাথে সাথেই লেগে যান তিনি আমাদেরকে সহায়তা দিতে। কিছুক্ষণ চেষ্টা তদবিরের পরই হাজির করলেন একজন রাজাকার এবং একজন আল-বদরকে। ঐ রাজাকার আমাদেরকে প্রচুর তথ্য দিলেও আল-বদর সদস্য স্পষ্টত অনেক তথ্যই গোপন করে। আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। যাই হোক আনিসুল আলমকে কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে বিকেলে ফিরে আসি শহরে। সাক্ষাৎকার নেই এডভোকেট শফিকুর রহমানের। তিনি দিলেন একজন আল-বদর কমান্ডারের একটি ডায়েরির সন্ধান। রাতে সিরাজ উদ্দিন এবং আজিজুল আম্বির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। আর, শফিক উদ্দিন কাজল আসার কথা থাকলেও আসেননি তিনি।

এবারে আরো কিছু রাজাকারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার চিন্তা থাকে মাথায়। যোগাযোগ করতে থাকি সব দিকে। এমন কি শান্তি কমিটির সদস্যদেরও সাক্ষাৎকার নেবার প্রচেষ্টা চালাই।

শহরে যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের কারো কারো কিছু তথ্য যাচাই করার জন্যে ৫ ফেব্রুয়ারি রওয়ানা করি তাজপুর। এবারে সাথী হলেন বন্ধু ফয়জুল হক চৌধুরী বাবুল। দেখা করি তাজপুরে কর্মরত মেডিকেল অফিসার ডা. মইন উদ্দিন আহমদ জায়গীরদারদের সঙ্গে। চেম্বারেই নিয়ে বসান আমাদেরকে। তারপর জানালাম আমার উদ্দেশ্য। রাজি হলেন সাক্ষাৎকার দিতে। একাত্তরের সেই ভয়াবহ দিনে তিনি হয়েছিলেন পাক সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি। সিলেট আবাসিক স্কুলে বন্দি থাকাকালে দেখেছেন বহু জামায়াত নেতাকে। ওরা যাতায়াত করতো সেখানে বীরদর্পে। কখনো পাক সৈন্যদের সঙ্গে, কখনো একাই। কোনো কোনো সময় সামরিক যানে করেই যাতায়াত করতেন তারা। পাক সেনাবাহিনীর সৈনিকরা তাদের অফিসারদের মতোই সমীহ করতো জামায়াত ছাত্র সংঘ নেতা আল-বদর কমান্ডারদেরকে। তাকে ধরিয়ে দেবার পেছনে কারা জড়িত ছিল। কিভাবে মুক্তি লাভ করেন–সবই জানালেন তিনি। সেখান থেকে ফেরার পর শহরে দেখা হয় বিয়ানীবাজারের বীর মুক্তিযোদ্ধা গল্পকার আব্দুল মালিক ফারুকের সঙ্গে। আমাদের কাজের কথা জানাই তাকে। সহায়তা চাই তার। এক বাক্যে রাজি হয়ে যান তিনি। ডেভিড বার্গম্যানকেও অবহিত করি বিষয়টি। তার সম্মতি নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে থাকি আব্দুল মালিক ফারুকের সাথে। এর পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি দিয়েছেন আমায় প্রচুর সহায়তা। নিজের মোটর বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রামে গ্রামে। শান্তি কমিটির দু'জন সদস্য, একজন রাজাকার কমান্ডার এবং একজন আল-বদর কমান্ডারের সাক্ষাৎকার গ্রহণে তার সহায়তা ছিল খুবই কার্যকর। বিভিন্ন সময়ে সেখানে সহায়তা নিয়েছি আব্দুল বাতিন

মাস্টার (ব্যবসায়ী), রফিক উদ্দিন তোতা মিয়া (ব্রিটেন প্রবাসী), আজিজুল পারভেজ (সাংবাদিক, দৈনিক কালের কণ্ঠ), আনোয়ার হোসেন বাবর (আমেরিকা প্রবাসী সাংবাদিক), সুদীপ ভট্টাচার্য (ব্যাংকার), তফাজ্জল হোসেন (শহীদ পুত্র ও শহীদ ভ্রাতা), শফিক উদ্দিন কাজল, মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, হাবিবুল ইসলাম খোকাসহ আরো অনেকের।

এদিকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার তাগিদ আসে কর্তৃপক্ষ থেকে। আর নিজেও অনুভব করছি এর প্রয়োজনীয়তা। বিশেষ করে আমার নিরাপত্তার জন্যেই তা করা দরকার। সিলেট শহরে অনেকেই নানাভাবে সহায়তা দিচ্ছিলেন। এর মধ্যে সর্বাগ্রে নাম উল্লেখ করতে হয় নূরুজাহান হাসপাতালের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা সেলিম আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান খান মাহতাব, শাব্বীর জালালাবাদি, মোহাম্মদ ফারুক আহমদ, হেরাল্ড রশীদ চৌধুরী, সুলতানা কামাল (সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা), এডভোকেট সুপ্রিয় চক্রবর্তী রঞ্জু, এডভোকেট আব্দুল মালেক, নূরুল আমীনসহ আরো অনেকের।

ফিল্মিং শুরু করার সাথে সাথেই কাজের পরিধি বেড়ে যায় অনেক। টেপগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হবে। এর জন্য বেশ কিছু লোকের দরকার হয়। এ কাজ করার জন্যে এগিয়ে আসেন সনি, দীপংকর মোহান্ত, বাবলী ও লাভলী ইয়াসমীন জেবা। এছাড়াও যখন যেখানে প্রয়োজন–সহায়তা নিয়েছি রুস্তম খানের।

তথ্য-উপাত্তের সাথে সাথে সময় সময় পরামর্শ নিয়েছি লেখক রফিকুর রহমান লজু, এডভোকেট আ.ফ.ম. কামাল (সাবেক পৌর চেয়ারম্যান), আইনজীবী তবারক হোসেন, এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরী (আওয়ামী লীগ নেতা, উপজেলা চেয়ারম্যান), এডভোকেট সৈয়দ আশরাফ হোসেন, জননেতা আব্দুল হামিদ (মরহুম), সাবেক মন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজী (মরহুম), জাসদ নেতা সাইফুর রাজ্জাক কিনু (মরহুম), ন্যাপ নেতা কামরুজ্জামান (মরহুম), মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক মুঈদ চৌধুরী (মরহুম)।

ফিল্মিং করার সময় প্রয়োজন হয় আরো কিছু লোকের। রিকন্ট্রাকশন, ইন্টারপ্রিটার ইত্যাদি কাজেও নিয়ে আসা হয় অনেককে। ঢাকা থেকে আসেন আহমদ হোসেনসহ আরো কেউ কেউ। আর সবার সম্মিলিত প্রয়াসেই সমাপ্ত হয় আমার প্রজেক্ট।

অনিমার আত্মহত্যার কাহিনী : দায়ী মিস্ত্রী বাহিনী

গোবিন্দশ্রী গ্রামটি অখ্যাত না হলেও খ্যাতিরও তেমন কোনো কারণ ছিল না। কুশিয়ারা নদীর বাম তীরে অবস্থান। অধিবাসীদের এক ব্যাপক অংশ প্রবাসী। শান্তিতেই বসবাস করতেন হিন্দু মুসলিম মিলে। বিরোধ বিসম্বাদ তেমন একটা নেই গ্রামে। সেখানকার সিরাজ উদ্দিন এসু মিয়া ছিলেন থানা পর্যায়ের আওয়ামী লীগ

নেতা। তার নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়েছে আওয়ামী লীগ। ভোট দিয়েছেন এলাকাবাসীরা বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগকে। তার আহবানেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। এরপর তো শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র যুদ্ধ। যে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন এলাকার বহু সূর্য সন্তান। নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন অনেকেই।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ৯৮ ভাগ মানুষ অবস্থান নিলেও কিছু কুলাঙ্গার জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামির শীর্ষ পর্যায় থেকে মাঠকর্মী পর্যন্ত প্রত্যেকেই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল লড়াকু। গোবিন্দশ্রী এলাকায় জামায়াত নেতা শফিক আহমদের বাড়ি। থানা শান্তি কমিটির সদস্য এবং জামায়াত গঠিত রাজাকার বাহিনীরও কমান্ডার। ক্ষমতা তার আকাশচুম্বি। শুধু ক্ষমতা নয়–এরা ছিল সমস্ত বিচার প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে। অবলীলায় মানুষ হত্যা করলেও বিচারের মুখোমুখি হবার প্রয়োজন পড়তো না। করেছেও তা-ই।

সেই গোবিন্দশ্রী বাজারে একদিন আবির্ভাব ঘটে মিস্ত্রী বাহিনীর। বাহিনী প্রধান আনই মিস্ত্রী ও মনই মিস্ত্রী। বসত তাদের চারখাই এলাকায়। পেশায় মিস্ত্রী। রাজনৈতিক আনুগত্য জামায়াতের প্রতি। পাকিস্তানি সৈন্যরা চারখাই অবস্থান নেবার পর গো-আযম থেকে শুরু করে প্রতিটি জামায়াত নেতা কর্মীর ন্যায়–এরাও হয়ে উঠে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী। মিস্ত্রীর কাজ করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় তাদের। হয়ে উঠে পাক সেনাবাহিনীর পদলেহী দালাল। আর, পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি গ্রুপ নিয়েই হাজির হয় গোবিন্দশ্রী গ্রামে।

প্রথমেই আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজ উদ্দিন এসু মিয়ার বাড়ি। পুড়িয়ে দিলো পুরো বাড়িটি। একই সাথে গোবিন্দশ্রী বাজারেও আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তেই ছাইভস্মে পরিণত হলো আলাউদ্দিন, আব্দুল মান্নান ও আরমান আলীর দোকান। হত্যাও করেছে লোকজনদের। আর ধরে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে বহু লোককে।

এসব জানতেই গিয়েছি গোবিন্দশ্রী। সেদিনও সাথে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালিক ফারুক। সেখানে প্রথমদিন পাকিস্তানি সৈন্যরা গিয়েই হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে আব্দুল ওয়াহিদকে দিয়ে। বাজারেই গুলি করে হত্যা করে তাকে। এ সময় বাজারে, গ্রামে যাকে যেখানে পেয়েছে তাকেই বন্দি করে। তারপর চালায় শারীরিক নির্যাতন। হিটলারের গ্যাস্টাপো বাহিনীর ন্যায় চালিয়েছে নির্যাতন। এলাকাবাসী মিসবাহ্ উদ্দিন জানান, নির্যাতিতদের সংখ্যা ছিল ২৫ জনের মতো। এর মধ্যে নাম উল্লেখ করেন বসারত আলী, লুৎফর রহমান, সুলতান মিয়া, আসাদুর আলী, রমজান আলী এবং মিসবাহ্ উদ্দিনের। পাওয়া যায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা নাজিম উদ্দিনকে। তিনি বলেন গোবিন্দশ্রী এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক ছিলেন সিরাজ উদ্দিন এসু মিয়া। এছাড়াও সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন আজিজুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক

কাদির, ফজলুর রহমান এবং তিনি নিজে। আর, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালালি করেছেন মজম্মিল আলী, নজমূল আলী ও শফিক। এ সময় অন্য একজন বলেন–'শফিক তো পাকিস্তানি সৈন্যদের দালালি করেনি। বরং ওরাই তার দালালি করেছে। মনে হয়েছে সাধারণ সৈন্যরা তার দেহ রক্ষি হিসেবে কাজ করেছে। আদেশ নির্দেশ পালন করেছে। সে-ই যেন ছিল বস।

জানতে চাই শফিক সম্পর্কে আরো অধিক। নাজিমউদ্দিন বলেন, গোবিন্দ্রশ্রী গ্রামের ছেলে শফিক। ভালো নাম তার ফয়জুল হক। একাত্তরে ২৫ বছরের যুবক। তখনই ছিল জামায়াতের ক্যাডার। সম্ভবত মাদ্রাসায় পড়ার কালেই জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল। কোথায় কোনো মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছে সে? জানতে চাই আমি। বললেন সিলেটের লামাকাজী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল শফিক। তবে, সেখানকার পড়া শেষ করেছিল কী না কিংবা কতটুকু পড়াশোনা করেছে তা জানেন না।

গোবিন্দশ্রী বাজারের সেক্রেটারি নজমূল ইসলাম (আলাউদ্দিন)। জানালেন চারখাইয়ের শেখ পাড়া গ্রামের বাসিন্দা আনই। ভালো নাম তার আয়ুব আলী আনু। আর মনই (সখাওত আলী) মিলে পাক সেনাদের নিয়ে আসে গ্রামে। প্রথমেই হত্যা করে একজন অন্ধ লোককে। তিনি বলেন, 'ছোট বেলা থেকেই শুনে আসছিলাম অন্ধ বোবাদের কোনো শত্রু নেই। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের শত্রু হয়ে গেলেন অজগাঁয়ের এক অন্ধ লোক। পাকিস্তান রক্ষার জন্যে হত্যা করতে হলো তাকে।'

অভাগি অনিমা। তাকে ধরে নিয়ে যায় এই আনই মনইয়ের প্ররোচনায়। ৪ দিন চারখাই আর্মি ক্যাম্পে রাখার পর যখন ছেড়ে দিয়েছে–তখন মেয়েটির প্রতি তাকানোও কষ্টকর হয়ে উঠে। নিজ নিজ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় লুৎফুর রহমান, কামাল উদ্দিন, ডা. ফয়জুল হক ও ফখরুল ইসলামকে। এক রাত আটকে রাখে বিয়ানীবাজারে। আর প্রহারে প্রহারে ক্ষত বিক্ষত করে তুলে তাদেরকে। এছাড়াও ধরে নিয়েছিল দেউল গ্রামের গোলাম মোস্তফা মাস্টার, আব্দুল হান্নান, নজমূল ইসলাম, আব্দুল মান্নান এবং মোহাম্মদপুরের বাহার উদ্দিন ও আব্দুল মুকিতকে।

রাজাকার কমান্ডার শফিক সম্পর্কে তিনি যোগ করেন আরো কিছু তথ্য। সে ছিল জামায়াতের একজন নেতা। পাকিস্তানি সৈন্যদের অতি ঘনিষ্ঠ সহচর। হত্যা, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ ইত্যাদি করেছে বিয়ানীবাজার এবং জামালগঞ্জ থানা জুড়ে। তিনি বলেন, 'শফিক ছিল রাজাকার বাহিনীর এ দু'থানার কমান্ডার। আর, পাক বাহিনী পালিয়ে যাবার কালে সেও চলে যায় সে দেশে। '৭৫ এর পর থেকে প্রায়ই আসে দেশে। চলাফেরা করে রাজার হালে। এলাকাবাসীও থাকেন ভয়ে ভয়ে।

সিলেট সদর থানার দাউদপুর একটি ইউনিয়ন। আর রেঙ্গা-দাউদপুরের তিরাশি গ্রামেই বাস করতেন জগদীশ পুরকায়স্থ। তার স্ত্রী সুকৃতি পুরকায়স্থ সন্তানদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন গোবিন্দশ্রী গ্রামে ভাইয়ের বাড়িতে। সেখান থেকে ৭ মে অন্যান্যদের সাথে ধরে নিয়ে যায় তাকে এবং তার মেয়েদেরকে। এ সম্পর্কে সুকৃতির

ভাই অজয় পুরকায়স্থ কথা বলেন অত্যন্ত খোলামেলা। তার মতে সেদিন ছিল ৭ মে। বাংলা ২৪ বৈশাখ। রাত ১০ টায় বাড়ি ঘেরাও করে পাক সৈন্যরা। সাথে এ দেশীয় দালাল। আর তারা হলো আনই, মনই। বন্দি করে তাদের সবাইকে। লুট করে নেয় বাড়ির মালামাল। এর মধ্যে ছিল ৫ ভরি স্বর্ণ, নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং রেডিও।

তিনি বলেন অন্যান্য গ্রামেরও প্রচুর লোকজন ধরে এনেছিল হায়েনারা। সবাইকে নিয়ে যায় বাজারের পাশে একটি সেতুর উপর। সেখানে বন্দিদের বিভক্ত করে হিন্দু এবং মুসলিম হিসেবে। তারপর ছেড়ে দেয় মুসলমানদের। আর হিন্দুদের উঠায় একটি নৌকায়। কুশিয়ারা নদী দিয়ে নিয়ে যায় খরস্বতী নদীর মোহনা পর্যন্ত। নামানো হলো সবাইকে তীরে। এক সারিতে দাঁড় করায় বন্দিদের। সামনে বন্দুক ধরে ট্রিগার টানার মহড়া দিচ্ছে। এ সময়ই পাকিস্তানিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সুকৃতি ও তার মেয়ে অনিমা সীমার প্রতি। স্তম্ভিত হয়ে যায় এরা। কিছুক্ষণ পালন করে নিরবতা। তারপর নামিয়ে নেয় আগ্নেয়াস্ত্র। ছেড়ে দিলো সকলকে। শুধু রেখে দেয় অনিমা পুরকায়স্থ এবং সুকৃতি পুরকায়স্থকে। আরো কিছুদূর গিয়ে মুক্তি দেয় সুকৃতিকেও। শুধু অনিমাকে নিয়ে যায় চারখাই অবধি। ১৬ বছর বয়সী এই তরুণীর উপর চরিতার্থ করেছে পশুবৃত্তি। এর জন্যে দায়ী আনই, মনই এবং শফিক।

স্বাধীনতার পর অজয় পুরকায়স্থই মামলা করেছিলেন আনই মনইকে আসামী করে। কিন্তু '৭৫ এর পর আর মামলা চলেনি। অনিমার একটি বিয়েও হয়েছে। স্বামী অনুকূল চন্দ্র দাস। বাড়ি গোপালগঞ্জ থানার ঘোষগাঁও। পেশায় কাঠমিস্ত্রী। আর বয়স অনিমার পিতার চেয়েও বেশি।

অনিমা দাসের একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাই। শুরু করি নানাভাবে প্রচেষ্টা। এ সময় সহায়তা লাভ করি বড়লেখা পি.সি. হাইস্কুলের শিক্ষক মিহির দাস এবং গোবিন্দশ্রী হাইস্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক স্বপন চন্দ্র ধীরের। মামা অজয় পুরকায়স্থও ছিলেন সহানুভূতিশীল। তিনি তার ভাগ্নিকে নিজ বাড়িতে এনে সাক্ষাৎকার দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলাম আবার পুরকায়স্থ বাড়িতে। কিন্তু অনিমা আসেননি। এসেছেন তার স্বামী অনুকূল চন্দ্র দাস। বললেন, একাত্তর সালে পাকিস্তানি মানুষ রূপী পশুগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জাতির উপর। ক্ষত বিক্ষত করেছে বাঙালিদের। অনিমাও হয়েছিল বীরাঙ্গনা। তিনি তা জেনেও বিয়ে করেছেন তাকে। এসব কথার কালেই শুরু করেন কান্না। তার সে কান্না আর থামলো না। কোনো প্রশ্নও করা যায়নি। আর তাকে জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। তিনি তো সে সময় জানতেন না কিছুই।

জানতে চাই–অনিমার সঙ্গে দেখা করা কি সম্ভব হবে? অজয় পুরকায়স্থের কোনো আপত্তি নেই তাতে। তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তিনি চান পাকিস্তানি পশুদের বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের কাহিনীগুলো দেশের মানুষ জানুক। নতুন প্রজন্মকে তা অবহিত করানো দরকার। কিন্তু অনুকূল চন্দ্র দাস ততটুকু চান না। সমাজের কাছেই

তা হলে আরো অধিক হেয় হবেন তিনি। আর অনিমা! প্রাণ থাকতে এ বিষয়ে কারো সাথেই কথা বলবেন না। সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মামাকে এবং স্বামীকে।

এর আগে অজয় পুরকায়স্থ জানিয়েছিলেন অনিমা অমত করবে না। সত্য প্রকাশের স্বার্থে আমার সঙ্গে দেখা করবে। এ কথাটি স্মরণ করিয়া দিলে অজয় পুরকায়স্থও তা স্বীকার করে বলেন, 'চেষ্টা করেছি আমি। অনিমাও রাজি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে মত পাল্টে নিয়েছে। অনেক কান্নাকাটি করেছে। এখন আর কোনো ভাবেই রাজি হবে না। স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, জোরাজুরি করলে সে আত্মহত্যা করবে।' একথা শুনে তো চমকে উঠি আমি। ফিরে আসি সেখান থেকে।

দেখা হয়নি অনিমা দাসের সঙ্গে। কথা বলতে পারিনি তার সঙ্গে। আর, এ সবই হচ্ছে আমাদের ঘৃণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার ফসল। সমাজের এই অবস্থার কারণেই হয়তো রক্ষা পাচ্ছে আনই-মনই-শফিক কুটুমনারা।

জামায়াতের কুটুমনা : দুঃসাহসী, মদ্যপ ও নারীবাজ

বিয়ানীবাজার মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে সবাই শুরু করেন জামায়াত ও আব্দুল হক কুটুমনা দিয়ে। সমাপ্তিতেও চলে আসে এ দু'টি শব্দ। আব্দুস সাত্তারও বাদ যাননি। থানা সদরের লাগোয়া গ্রাম কসবায় তার বাড়ি। গোলাপিয়া পাবলিক লাইব্রেরি পরিচালনা করতেন তিনি। পড়াশোনা ছিল প্রচুর। জ্ঞানের পরিধিও বিশাল। সে কারণে, লোকে বলতো তাকে চানক্য। যে কোনো আলোচনায় উদাহরণ টানতেন মনীষীদের, খ্যাতিমান লেখকদের। যুক্তি ও দার্শনিক উদাহরণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতেন নিজের বক্তব্য।

১৬ ফেব্রুয়ারি। বিয়ানীবাজার থানা সদরেই সাক্ষাৎ করি তার সাথে। সে থানায় যুদ্ধাপরাধ সংগঠনে কাদের মূখ্য ভূমিকা ছিল জানতে চাই সরাসরি। জবাব তার খুবই স্পষ্ট। বললেন, 'জামায়াতে ইসলামি দলীয় দালালরাই ছিল অগ্রবর্তী।' তারপর যুক্ত করেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে কুখ্যাত আব্দুল হক কুটুমনার জন্ম এ থানাতেই। বিয়ানীবাজার ইউনিয়নের শ্রীধরা গ্রামে তার নিবাস। প্রথম থেকেই সে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আসক্ত। প্রথমত: জামায়াতে ইসলামি। দ্বিতীয়ত: রং বেরংয়ের তরল পানীয়। আর, তৃতীয়ত: নারীদেহ। ছোটবেলা থেকেই ছিল দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া। একসময় বসবাস করতো খুলনায়। সেখানে সংগঠিত করেছে অসংখ্য অপরাধ কর্ম। এসব গুণের কারণেই পাক হানাদার বাহিনীর কাছে ছিল তার অপরিসীম কদর।

একটি থানাতেই কয়েক শ' ধর্ষিতা নারীর চিকিৎসা হয়েছে। এছাড়াও লোক চক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে যে কত মা-কত বোন কোনো চিকিৎসা ছাড়াই সহ্য করেছেন গঞ্জনা–তার ইয়ত্তা নেই। স্মরণ করেছেন কবি গুরুর 'সহে না যাতনা'-অথচ সহে নিতে হয়েছে সবই। ভারতে যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে তাদের

নাম-পরিচয় জানতেন সংশ্লিষ্ঠরা। অন্যদের কথা কেউ জানে না। এই যে সহস্র নারীর সম্ভ্রম হানি–এর জন্যে দায়ী কে? আব্দুস সাত্তার আবারো সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'জামায়াতে ইসলামী। এই যে আব্দুল হক কুটুমনা–সে একাই তো শত শত নারীর সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে। ছিনিমিনি খেলেছে ওদের ইজ্জত নিয়ে। আর সে ছিল জামায়াতের লোক। আজো আছে-তাই। তা হলে বুঝে নিন ঘটনাটি।' কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনা আছে? যা সংঘটিত করেছে জামায়াতের লোকেরা? 'অসংখ্য' উত্তর দিলেন আব্দুস সাত্তার। 'আব্দুল মান্নান ছিলেন একজন সুপরিচিত লোক। ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে পরিচিত ছিল সমগ্র সিলেট অঞ্চল জুড়ে। তাকে হত্যা করিয়েছে কে? কারা এর জন্যে দায়ী জানেন? পেয়েছেন কোনো তথ্য? এই যে জামায়াত দলীয় দালাল তৈমুছ আলী, আব্দুল হেকিম তাপাদার, আব্দুল খালিক, শফিউর রহমান (টুনু মিয়া), ছমির উদ্দিন, জালাল মাস্টার এবং মছাব্বির আলীরা। এরা সবাই তো জামায়াতের নেতা এবং শান্তি কমিটির সদস্য।

শহীদ আব্দুল মান্নানের পুত্র এডভোকেট সাঈদ আহমদ মুহিত স্বপন। সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, তার পিতা আব্দুল মান্নানকে হত্যার পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে সিলেট শহরে। সেখানে হাজী ছরকুম আলীর বাসায় আব্দুর রহিম বচন হাজী, মজম্মিল আলী (কালা মিয়া), ও ছরকুম আলীরা মিটিং করে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ ব্যাপারে আব্দুস সাত্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বলেন, 'পরিকল্পনা তো অনেকেই অনেকভাবে করেছে। দেখতে হবে–কোনো পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন হয়েছে এবং কারা করেছে। জামায়াতের লোকেরা তো জামায়াত নেতাদের পরিকল্পনাই আগে বাস্তবায়ন করবে। এটি খুব সহজ হিসেব।'

আব্দুল বাতিন মাস্টার এবং জামায়াত নেতা আব্দুল হেকিম তাপাদার ছিলেন একই পাড়ার বাসিন্দা। খুবই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। হেকিম তাপাদার জামায়াতের থানা পর্যায়ের একজন নেতা এবং বাতিন মাস্টার আওয়ামী লীগার। সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায় তাকে। মুখোমুখি করে মেজর সিদ্দিকের। তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে শান্তি কমিটির অন্যতম নেতা এবং জামায়াত নেতা আব্দুল হেকিম তাপাদারের প্রভাবই ছিল যথেষ্ট। শুধু তিনি বললেই ছেড়ে দিতো হয়তো। আর, একজন প্রতিবেশী হিসেবে হেকিম তাপাদার তা করবেন–বলেই মনে করতেন বাতিন পরিবারের সদস্যরা। তার ভাই আব্দুল বাছিত। ছুটে যান হেকিম তাপাদারের কাছে। ভাইয়ের মুক্তির সুপারিশ করার জন্য কত অনুনয় বিনয় যে করেছেন–তার শেষ নেই। কিন্তু হেকিম তাপাদার তা করতে রাজি হননি। সুপারিশ করেননি কোনোভাবেই।

এদিকে আব্দুল বাতিন মাস্টারের উপর নির্যাতন চালিয়েছে নির্দয়ভাবে। এক পর্যায়ে বেঁধে ফেলে তার চোখ। হত্যা করার জন্য নিয়ে যাবে বধ্যভূমিতে। এ সময়েই শান্তি কমিটির অপর সদস্য মৌলানা ছমির উদ্দিন হাজির হন সেখানে। একজন ভালো

লোক এবং মুসলমান হিসেবে সনাক্ত করেন তাকে। তারপর তিনি নিজেই আব্দুল বাতিন মাস্টারের জামিন হয়ে মুক্ত করতে চান তাকে। ইতোমধ্যে বয়ে গেছে দু'দিন। জামিনও মঞ্জুর হয়েছে তার। কিন্তু বাঁধ সাধলেন থানা শান্তি কমিটির আহবায়ক বচন হাজী। জুড়ে দিলেন শর্ত। আব্দুল বাতিন মাস্টার জামিনে মুক্ত হতে চাইলে সবার সামনে ৭ বার মাটিতে শুয়ে নাক লাগাতে হবে ভূমিতে। তাই করতে হয়েছিল তাকে। দু'দিনের বন্দিদশায় কি প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানে? প্রশ্ন করি তাকে। উত্তরে জানালেন, সহ-বন্দি হিসেবে তিনি পেয়েছেন মতিউর রহমান ও তার বাবা, আব্দুর শুকুর মাস্টার, কামাল ও বাহাউদ্দিনকে। আর, দালালদের মধ্যে যারা পাক সেনা কর্তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন–তারা হলেন জামায়াতের আব্দুল হক কুটুমনা ও শফিক আহমদ। গিয়েছেন আব্দুর রহিম, বচন হাজী এবং ডা. মঈন উদ্দিন আহমদরাও।

রাজাকার আব্দুল হক কুটুমনাকে দুঃসাহসী, মদ্যপ ও নারীবাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন আব্দুল বাতিন মাস্টার। তার দলীয় পরিচয় ছিল। তিনি আওয়ামী লীগার। কিন্তু কুটুমনাদের পক্ষের লোকেরা কি বলেন? তারই পাশে অবস্থান ছিল শান্তি কমিটিতে মৌলানা ছমির উদ্দিনের। তার কাছে জানতে চাই এ সম্পর্কে। মৌলানা ছমির উদ্দিন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শান্তি কমিটি কিংবা সমস্ত দালালদের ভাগ করেছেন বিভিন্ন গ্রুপে। তার মতে মে মাসে বিয়ানীবাজার থানা সদরে আসে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী। অভ্যর্থনা জানান জামায়াত ও মুসলিম লীগের থানা পর্যায়ের প্রধান নেতারা। তবে, জামায়াত নেতারা ছিলেন খুব বেশি আগ্রহী। ওদের পরামর্শে পি. এইচ. জি. হাইস্কুলে আহবান করে একটি সভা। আর, সে সভাতেই গঠিত হয় বিয়ানীবাজার থানা শান্তি কমিটি। এর আহবায়ক হন মুসলিম লীগ নেতা আব্দুর রহিম বচন হাজী। কিন্তু সেক্রেটারি পদের দাবিদার জামায়াত। একই সাথে দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন মুল্লাপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু বকর (ময়না)। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তিনি নাম উল্লেখ করেন থানা জামায়াতের আমির আব্দুল খালিক, জামায়াত নেতা আব্দুল হেকিম তাপাদার, আব্দুল হক কুটুমনা, মছদ্দর আলী, তৈমুছ আলী, ফুরকান আলী মাস্টার, নছির আলী মেম্বার, ইউসুফ আলী, মইয়ার আলী, মজম্মিল আলী, রাজা মিয়া, চুনু মিয়া, মহব্বত আলী মোল্লা, জহির উদ্দিন, কুতুব মিয়া, সুলেমান হোসেন খান, মোক্তার আলী, মাসুক হাজী, সিকান্দর আলী, জামিল রেদওয়ান (বোরখা হাজী), আহমদ হোসেন খান, সফিউর রহমান (টুনু মিয়া), মৌলানা ছাদ উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, মইন মেম্বার, মতছিল আলী প্রমুখ। এ ছাড়াও ১০জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন সদস্য।

এই সদস্যদের ভাগ করেন তিনি অতি বিপজ্জনক, বিপজ্জনক এবং কম বিপজ্জনক হিসেবে। আর অতি বিপজ্জনক ক্যাটাগরিতে প্রথম নামটি-ই বলেন আব্দুল হক কুটুমনা। তারপর শফিক আহমদ। তৃতীয় স্থানে তৈমুছ আলী। এভাবেই একাত্তরে আব্দুল হক কুটুমনা এবং জামায়াতিদের অবস্থান নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, তাদের

থানায় শান্তি কমিটিতে ছিল জামায়াতে ইসলামির প্রাধান্য এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তারাই প্রভাব বিস্তার করতেন।

শান্তি কমিটিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব কেন্দ্রিক বিভাজনও করে দেখান। জামায়াতের নেতাকর্মী যারা থানা শান্তি কমিটিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল–তাদেরও অনেকের নাম বলে যান অনর্গল। তার মতে আব্দুল হেকিম তাপাদার, তৈমুছ আলী, সুলেমান হোসেন খান, ছাদ উদ্দিন, জামিল রেদওয়ান বোরখা হাজী, আব্দুল খালিক (জামায়াতের থানা কামটি), আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল হক কুটুমনা, কাজী ইব্রাহীম আলী প্রমুখ ছিলেন জামায়াতি।

থানা শান্তি কমিটির আহবায়ক বচন হাজী। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন গন্ডল বচন হাজী অপেক্ষা কুটুমনাকে মূল্য দিতো বেশি। শুনতো তার কথা। কিন্তু কেন? এর কারণও জানালেন ছমির উদ্দিন। তার মতে–কুটুমনা ক্যাপ্টেন গণ্ডলের চাহিদার চেয়েও অধিক সূরা এবং সাকী সরবরাহ করতে সক্ষম ছিল। টাকাও কামাই করেছে প্রচুর এবং সূরা-সাকীর পেছনে দু'হাতে টাকা ঢালতেও অভ্যস্ত ছিল। তিনি বলেন, বচন হাজী নিজেও কামিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। কিন্তু খরচ করেননি ওর মতো। যে কারণে গণ্ডল প্রাধান্য দিতো কুটুমনাকে। তা হলে কি রাজাকার বাহিনীর থানা কমান্ডার ছিল সে? কে ছিল কমান্ডার তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। তবে, আব্দুল হক কুটুমনা নয়। বললেন, 'সম্ভবত ছিল ফুরকান আলী মাস্টার। তবে, কুটুমনা এবং শফিক ছিল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আল-বদরদের নাম জানতেন-অনেকেরেই। তবে, থানা কমান্ডার কে তা জানেন না। বললেন, জামায়াত আল-বদর বাহিনীর কারোরই পরিচয় বাইরে প্রকাশ করতো না। শুধু জানতেন শীর্ষ নেতারা।

মৌলানা ছমির উদ্দিন মুখস্থ বলতে পারেন শান্তি কমিটির তালিকা। রাজাকার তালিকাও। কোনো দালাল বা রাজাকার আল-বদর ছাড়া কার কি ক্ষতি সংগঠিত হয়েছে–সবই তার জানা। কখন, কোথায়, কি, কার সঙ্গে করেছে, কার দ্বারা প্রণীত হয়েছে হত্যা তালিকা–কিছুই অজানা নেই তার। অথচ নিজেকে শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে স্বীকার করেন না। জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে তার নিজের সম্পৃক্ততাও অস্বীকার করেছেন। তা হলে এত সব জানেন কি করে? তার নিজেরও একটা ব্যবস্থা ছিল। বললেন, নিজের জান-মাল রক্ষা করতেই ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। যে কারণে ডাক বাংলোয় যাতায়াত ছিল নিয়মিত। বাধাও পাননি কখনো। একটা সম্পর্কও হয়ে যায় সবার সঙ্গে। তাই, কোনো তথ্য পেতেই সমস্যা হতো না তার।

এসব তথ্য যাচাই করতে সহায়তা নেই থানা শান্তি কমিটির অন্য একজন সদস্য এবং রাজাকার কমান্ডার মছদুর আলী মষট্টির। ১৭ ফেব্রুয়ারি কসবা গ্রামের বিলেত প্রবাসী রফিক উদ্দিন তোতা মিয়ার বাড়িতেই গ্রহণ করি মষট্টির সাক্ষাৎকার। শুরুতেই নিজের পরিচয় দিলেন মুসলিম লীগের একজন কর্মী হিসেবে। একাত্তর সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিয়ানীবাজারে অবস্থান নেবার পর তার দলীয় নেতা কর্মীরাও

সংগঠিত হতে থকে। পাক বাহিনী শান্তি কমিটি গঠনের পরামর্শ দি৷ে–তাই করা হয়। তিনি নিজেও ছিলেন শান্তি কমিটির একজন সদস্য। মৌলানা ছ্মির উদ্দিন প্রদত্ত শান্তি কমিটির সদস্যদের তালিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্তব্য করেন, 'যে নামগুলো তিনি বলেছেন–সেগুলো ঠিকই আছে। তবে, এর বাইরে৷ রয়ে গেছে অনেক সক্রিয় সদস্যের নাম।' থানা শান্তি কমিটির কোনো কোনো সক্রিয় সদস্যের নাম বাদ দিয়েছেন তিনি? উত্তরে জানান, 'গনিউর রাজা চৌধুরী, বাহার উল্লাহ্ মুন্‌শী, হাজী আব্দুল কাইয়ুম, কয়েস চৌধুরী, হাজী আব্দুল মঈন চৌধুরী, ফাত্তাহ্ মিয়া চৌধুরী, আব্দুস সালাম, তেরা মিয়া চৌধুরী, তাহির আলী, কটাই মিয়া, বদর উদ্দিন, আব্দুস ছাত্তার (বচন), আলাউদ্দিন আনাই, আব্দুল মান্নান, মৌলানা ছমির উদ্দিন, হাফিজ উদ্দিন (মালাই), সিতাই বিবি, শামসুদ্দিন বাজিদ মিয়া প্রমুখ।

নিজে থেকেই বলে চললেন, 'শান্তি কমিটিতে ছিল দু'টি ধারা। একটি জামায়াতিদের। অন্য ধারা মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য দলীয় সদস্যদের। তবে, জামায়াতিদের অবস্থান ছিল খুবই শক্ত। তাদের মতো করেই গৃহীত হয়েছে সিদ্ধান্ত। থানা শান্তি কমিটি ছিল জামায়াত দ্বারা প্রভাবিত। জামায়াতি সদস্যরা ছিলেন–আব্দুল খালিক মছরির, শফিক আহমদ, সফিউর রহমান (টুনু মিয়া মৌলভি), আব্দুল হেকিম তাপাদার, তৈমুছ আলী, আবুল কালাম আজাদ, আলী আহমদ, সুলেমান হোসেন খান, ছাদ উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, হাফিজ, উদ্দিন, আব্দুর নূর, ঈর্শ্বাদ আলী ও তোফাজ্জল হোসেন বাবুল।'

মছদ্দর আলী মষম্ভি জানান, বিয়ানীবাজার থানায় প্রায় ৫শ রাজাকারের এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১শ' ৫০ জন ছিল থানা সদরে। জানতে চাই, রাজাকার বাহিনীর থানা কমান্ডার কে ছিল? ঝটপট উত্তর দিলেন, 'ঘুঙ্গাদিয়ার বাবুল।' আর, আল বদর? 'জামায়াতের সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব বাহিনী আল-বদর। গঠন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ছিলেন–আব্দুল হেকিম তাপাদার, আব্দুল খালিক মহরির, সফিউর রহমান (টুনু), সুলেমান হোসেন খান, আব্দুর রাজ্জাক, আহমদ হোসেন খান, আলী আহমদ, আবুল কালাম আজাদ, শামসুদ্দিন, লিয়াকত আলী সদাই, আব্দুল মান্নান, আব্দুল হান্নান এবং ইউসুফ আলী। তাদেরই কেউ একজন ছিলেন থানা কমান্ডার। আল বদর বাহিনীর ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করার এখতিয়ার আমাদের ছিল না। তবে, ওরা সভা করতো প্রায়ই। তাদের সভায় যোগ দিতেন ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, আবু সায়ীদ এবং আব্দুর রাজ্জাক। ওরা সবাই ছিলেন জেলা ছাত্র সংঘের নেতা এবং জেলা আল-বদর বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার।

রাজাকার বাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার আব্দুল হক কুটুমনা। শান্তি কমিটির সদস্য এবং রাজাকার কমান্ডার হিসেবে তার কর্মকাণ্ডের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করি। মষম্ভির উত্তর-'দেখুন ইসলামের কথা বলে–রাজনীতি করে জামায়াত। সেই জামায়াতেরই নেতা আব্দুল হক কুটুমনা, শফিক আহমদ, আব্দুল হেকিম

তাপাদার, তৈমুছ আলীরা। অথচ, ইসলামের সর্বাধিক গর্হিত কাজগুলো করেছে তারা অবলীলায়। সুপাতলার ঘোষ বাড়ির পুরো পরিবারকে আব্দুল হক কুটুমনাই ধরিয়ে নিয়ে আসে। সে সময় ডাক বাংলোয় উপস্থিত ছিলেন জামিল রেদওয়ান, তৈমুছ আলী, আব্দুল হেকিম তাপাদার, ডা. মঈন উদ্দিন আহমদ, আব্দুর রহিম বচন হাজী এবং কুটুমনা। ক্যাপ্টেন গণ্ডল উপস্থিত সকলের মতামত চায় এদের ব্যাপারে। আর, কুটুমনাই বলে উঠে হত্যা করতে হবে। জামায়াতেরই নেতা আব্দুল হেকিম তাপাদার বলেন, 'বিচ্ছুর বাচ্চা বিচ্ছুই হয়। ছেড়ে দিলে ঠিকই কামড় দিবে। এ দু'জনের মন্তব্য শুনেই হত্যা করার নির্দেশ দেয় ক্যাপ্টেন ইফতেখার হোসেন গণ্ডল।'

বিয়ানীবাজার থানায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ মিলিয়ে যত লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের সবাই কুটুমনাকে নারী ধর্ষক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন? একটু আমতা আমতা করে শুরু করেন তিনি–'সবাইতো-সব কথা জানেন। আমাকে আবার বলতে হবে কেন?' রফিক উদ্দিন বললেন, 'সবার কথাই যাচাই করতে হবে তোমাকে।' বললেন, 'এসব কথা কি করে বলি!' লড়াই বিশ্বাসের মেয়ে অঞ্জলি। তাকে তুলে নিয়ে আসা হয় তারই নির্দেশে। বিয়ে করলো কুটুমনা। সে বিয়েতে ডা. মঈন উদ্দিন আহমদ, আব্দুল হেকিম তাপাদারসহ সবাই উপস্থিত ছিলেন। উপহার দিয়েছেন। ডা. মঈন দিলেন খাসি। অথচ মেয়েটিকে ভোগ করতো কুটুমনা এবং ক্যাপ্টেন গণ্ডল মিলে। এর আগে ভোগ করেছেন মজির উদ্দিন। মনির আহমদের মেয়েকে নিয়ে রাত কাটিয়েছে কুটুমনা–একটি মক্তবে। সে রাতে তার সাথে ছিল ইউসুফ আলীও।'

এ পর্যায়ে নারী নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা দেন। এর অধিকাংশই সংঘটিত হয়েছে আব্দুল হক কুটুমনা এবং অন্যান্য জামায়াতি রাজাকার ও দালালদের দ্বারা। তিনি জানান এখন আর কিছুই গোপন রাখতে চান না। তাকে ব্যবহার করে যারা কু-কর্ম সম্পাদন করেছে শত শত নারীর ইজ্জত হরণ করেছে, অসংখ্য লোক হত্যা করেছে, জমি ও বাড়ি দখলসহ অগনিত অপরাধ সংঘটিত করেছে–তারাই আবার সমাজে এবং রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত। আর, নিজে ছিলেন জেলে। এখনও প্রতিনিয়ত নিন্দা কুড়াতে হয় মানুষের। তাই সত্য প্রকাশ করে নিজেকে পাপমুক্ত করতে চান। সুযোগ পেলেই প্রকাশ করবেন সব কিছু।

মুল্লাপুর গ্রামের আব্দুল বাতেন তাপাদার অভিযোগ করে বলেন, তার গ্রামে পাকিস্তানি আর্মি নিয়ে গিয়েছিলেন আব্দুর রহিম বচন হাজী, আব্দুল মালিক তাপাদার দুদু মিয়া, আব্দুল হক, কটুমনা, রফিক আলী ও হারিছ আলী। বাড়ি পুড়িয়েছিল জেলা আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুল ইসলাম চৌধুরী, খয়রুল ইসলাম, মিম্বর আলী ও তার নিজের। তার তাই আব্দুল জলিল তাপাদারকে ধরে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে। এ ঘটনার জন্যে মামলা করেছিলেন। আসামী বচন হাজী, দুদু মিয়া ও কুটুমনা।

কোড ওয়ার্ড

বিভিন্ন সময়ে মৌলবাদিরা আমাকে হুমকি দিতে থাকে। শুধু তাই নয় আমাদের টিমে কাজ করতে আসা-সাংবাদিক মেহেদী হাসানও রেহাই পাননি। হোটেলে একদিন ফোন আসে কোথা থেকে। রিসিভ করেছিলেন মেহেদী। অপর প্রান্ত থেকে পরিচয় না দিয়েই অশ্রাব্য ভাষায় গালা-গাল দিতে থাকে তাকে। দেখে নেবার হুমকি দেয়া হয় সবার প্রতি। সাংবাদিক শামীম আকতারের উপর ক্ষতিগ্রস্তরাই চড়াও হয়েছি। সে বর্ণনা দেয়া হয়েছে অন্যত্র।

ঢাকায় আমাদের মূল কেন্দ্র ছিল বেইলি রোডে। সেখানেও ওদের চর প্রবেশ করেছিল একদিন। নানা ভাবে চেষ্টা করেছে আমাদের কাজের তথ্য বের করার। এ সব ঘটনার প্রেক্ষিতে সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন বাড়ি আমাদের। যদিও এসব নিয়ে ভাবিনি আমি। কিন্তু ডেভিড ছিলেন খুবই সতর্ক। কোনো ভাবেই যাতে আমাদের কাজ-কর্মের কোনো তথ্য বাইরে প্রকাশ না হয়–সে বিষয়ে যত্নবান হন তাৎক্ষণিক। সিলেটে যখন অবস্থান করেন–তখন সব কিছুই আলোচনা হয় সাক্ষাতে। সে সব বাইরে প্রকাশ হবার কোনোই সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ঢাকায় থাকলে প্রতিদিনই একাধিকবার ফোনালাপ করতে হয়। ফোনে আলাপ কালে ব্যবহারের জন্যে তিনি-ই নির্ধারণ করেন কিছু কোড ওয়ার্ড। যাতে অন্য কেউ শুনলেও কিছু বুঝতে না পারে। সে কোড ওয়ার্ডগুলোও ফোনে বলেননি আমায়। ঢাকা থেকে মেহেদীকে পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন তা ১৫ ফেব্রুয়ারি।

গবেষণার বিষয়বস্তু, পরিধি, কর্মক্ষেত্র এবং জড়িত সকলের পরিচিতি গোপন রেখে আমাদের গবেষণা কাজকে দ্রুততর করার লক্ষ্যে সে সময় আরো কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে ৯ ফেব্রুয়ারি এডভোকেট সুলতানা কামালের সিলেটস্থ বাসভবনে এক সভায় মিলিত হই আমরা। সেখানে ছিলেন শামীম আকতার, মেহেদী হাসান এবং এডভোকেট সুপ্রিয় চক্রবর্তী। পরে আনন্দ নিকেতন গিয়ে এ বিষয় নিয়ে সুলতানা কামালের সঙ্গেও আলাপ করেছি। তিনি নিজেও সমর্থন দিয়েছিলেন আমাদের সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি। আর, নতুনভাবে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর আলোকেই এগিয়ে যাই আমাদের কর্মকাণ্ড।

জামায়াতিদের সঙ্গে বেহেস্তেও নয়–

এত জঘন্য অপরাধ করার পরও জামায়াতিরা যদি বেহেস্তে যেতে পারে তা হলে সে বেহেস্তে যেতে চান না মৌলানা ছমির উদ্দিন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, কারাগারে জামায়াতে ইসলামির নেতাদেরকে এ কথাটি বলে দিয়েছেন তিনি।

মৌলানা ছমির উদ্দিনের বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার থানাধীন নবাং গ্রামে। তিনি নিজেও ছিলেন সে দলের সাথে সংশ্লিষ্ট (শান্তি কমিটির কয়েকজন সদস্য এ তথ্য দিয়েছেন)। যদিও মৌলানা ছমির উদ্দিন তা স্বীকার করেননি। তিনি নারীবাজ

হিসেবে বহুল আলোচিত আব্দুল হক কুটুমনার নারী ধর্ষণ বিষয়ে অনেক তথ্য দিয়েছে। একটি একটি করে বলেন। লাউতা ইউনিয়নের জলঢুপ হাইতি গ্রাম থেকে অঞ্জলিকে তুলে আনার কাহিনী। কিভাবে তাকে তুলে এনে গণ্ডল এবং সে ভোগ করেছে। অঞ্জলিকে রাখার জন্যে একটি পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করে বাড়ি দখল করেছিল। আর, সেখানে বাস করতো এই মেয়েকে নিয়ে। মৌলানা মনির আহমদের মেয়ে তুলে আনাসহ অনেকগুলো ঘটনা উল্লেখ করেন তিনি। কুটুমনার পাষণ্ডতার শত উদাহরণ দিয়েছিলেন ঐ সাক্ষাৎকারে।

তিনি জানান, মাথিউরা গ্রামের বাউল শিল্পী কমর উদ্দিনকে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন ছেড়ে দিয়েছিল। ঐ সময়ই চিঠি পাঠান শান্তি কমিটির অন্যতম নেতা এবং জামায়াত নেতা জামিল রেদওয়ান বোরখা হাজী। আর চিঠি পাঠ করার পর রাস্তা থেকে আবার ধরে এনে হত্যা করা হয় তাকে। নৌকা যাত্রী রইছ আলীকে ধরে নিয়েছিল জামায়াত দলীয় দালাল তৈমুছ আলী। তাকে ছেড়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছেন তিনি নিজে। থানার ও.সি. কোমরের বেল্ট খুলে ফেলেন। তবুও তৈমুছ আলী তাকে ছাড়েনি। অমানুসিক অত্যাচার করেছে তার উপর। পরে তাকে পাঠিয়ে দেয় সিলেটের খাদিমনগরে। সম্ভবত সেখানেই হত্যা করা হয়েছে তাকে।

বিয়ানীবাজারের দু'টি মসজিদের ইমামের স্ত্রীকেও ইজ্জত দিতে হয়েছে এই জামায়াতিদের হাতে। এমন কি একজন দালালের বোনও ধর্ষিতা হয়েছেন বলে জানান তিনি। মৌলানা ছমির উদ্দিন বলেন, ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, আবু সায়ীদ, আব্দুর রাজ্জাক, লুৎফুর রহমানদের সমর্থন ছাড়া এভাবে বেপারোয়া নারী নির্যাতন করতে পারতো না এরা। এত শত ঘটনার কিছুই কি জানতো না তারা? তিনি বলেন, এটা কোনো ভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, জেলা জামায়াতের নেতারা এসব নির্যাতনের কিছুই জানতো না। বরং এসব কাজে অনুযোগ দিয়ে তারা উৎসাহিত করতো।

এই যে কাজী ইব্রাহীম আলী। তিনি নিজেও এ থানারই সন্তান। বাড়ি ছিল পূর্ব থানা গ্রামে। নেজামে ইসলামের একজন নেতা। মুক্তিযুদ্ধকালে থানা শান্তি কমিটির অতি সক্রিয় সদস্য। মারাত্মক ক্ষতিকর দালালদের একজন। সেই ভয়াবহ দিনেই রচনা করেন একটি গ্রন্থ। তাতে বলা হয়, 'যারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধিতা করছে, যারা হিন্দুস্থানে গিয়েছে এবং যারা মুক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে তারা কেউ-ই আর মুসলমান থাকেনি। এরা কাফের হয়ে গেছে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ করাও জায়েজ। ইসলাম রক্ষার জন্যে যুদ্ধরত পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য বাঙালি রমণীদের ভোগ করাও জায়েজ।' তার এ গ্রন্থখানা প্রকাশ এবং বিলি বণ্টন করেছে জামায়াতে ইসলামী দলীয় ভাবেই। এসব তথ্য দিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন–'তারপরও কি বিশ্বাস করতে হবে- জেলা নেতাদের অনুমোদন ছিল না এ সব কাজে?'

এ থানায় যত লোক প্রাণ দিয়েছেন তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে একটি

তালিকা অনুযায়ী। আর, সে তালিকা প্রস্তুত করেছে শান্তি কমিটির জামায়াত দলীয় সদস্যরাই। এ কাজের মূল দায়িত্ব পালন করেছেন জামায়াত নেতা আব্দুল হেকিম তাপাদার। সাথে তৈমুছ আলী ও সুলেমান হোসেন খান। আর সহায়তা দিতো সি. আই. ডির আব্দুল হাই। সে নিজেও ছিল একজন জামায়াতি।

এভাবে একটির পর একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, এরা ধার্মিক নয়। ধর্মকে ব্যবহার করে–রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করে। এরা পবিত্র ইসলামকে ব্যবহার করে ইসলাম বিরোধী, মানবতা বিরোধী কাজ করে। একাত্তরে তারা যেসব অপরাধ কর্ম সংঘটিত করেছে তা কোনো বিধর্মীও করতে পারে না। সুতরাং তারা কোনো ভাবেই বেহেস্তে যাবার দাবি করতে পারে না।

স্বাধীনতার পরে দালাল আইনে এদের অধিকাংশই কারাগারে ছিলেন। মৌলানা ছমির উদ্দিনও দালালির অভিযোগে গ্রেফতার হন। তিনি জানান, কারাগারে এসব বিষয় নিয়ে জামায়াতি নেতাদের সঙ্গে বিস্তর আলাপ হয়েছে তার। তর্ক বিতর্ক হয়েছে। এক এক করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের কু-কর্মের ঘটনাগুলো। তারপর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে–'তোমরা যারা ইসলামকে ব্যবহার করে জামায়াতে ইসলামি করছো–একাত্তরের অপরাধ তোমরা ঢাকবে কি দিয়ে। হত্যা এবং নারী ধর্ষণের মতো মহা-পাপ করার পর তোমরা আবার ইসলামের কথা বলো কোনো মুখে? তোমরা এর পরও বেহেস্তে যাবার প্রত্যাশা করো? সে সম্ভব নয়-বেহেস্ত আর তোমাদের জন্যে থাকবে না। তারপরও যদি তোমরা বেহেস্তে যেতে পারো–তা হলে সে বেহেস্তে আমি যেতে চাইনা। জামায়াতিদের যে নৃশংসতা একাত্তরে দেখেছি, তারপর জামায়াতের সঙ্গে বেহেস্তে বাস করার ইচ্ছে আমার নেই।'

জামায়াতের পরিকল্পনা : আব্দুল বাতিনের তথ্য

একাত্তরের ভয়াবহ দিনে যে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ এবং অন্যান্য অপরাধ কর্ম সংঘটিত হয়েছে–এর মূল পরিকল্পনা জামায়াতে ইসলামির। এ তথ্য দিয়েছেন–জামায়েতের কোনো কোনো নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল–এমন একজন লোক। বাড়ি বিয়ানীবাজারে। পেশায় ব্যবসায়ী। বিয়ানীবাজারে ছিল তার পেট্রল পাম্প। নাম আব্দুল বাতিন মাস্টার।

১৯৯৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, কথা বলি তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসেই। তিনি বিয়ানীবাজারে অত্যন্ত ক্ষতিকর রাজাকার এবং শান্তি কমিটির সদস্যদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য দেন আমায়। জামায়াত নেতা এবং শান্তি কমিটির অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য আব্দুল হেকিম তাপাদার, আব্দুল হক কুটুমনা ও তৈমুছ আলী এবং মুসলিম লীগ নেতা ও থানা শান্তি কমিটির আহবায়ক আব্দুর রহিম উরফে বচন হাজীর নানা অপরাধ কর্ম তুলে ধরেন। তার মতে উপরোক্ত তিন জামায়াতি দালালসহ অন্যান্য জামায়াত নেতারা হত্যা তালিকা প্রণয়ন করতো। কোনো গ্রামের কার মেয়ে,

স্ত্রী বা বোনকে তুলে আনতে হবে, পাক সেনাদের কোনো কর্মকর্তার কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠাবে এসব তালিকাও প্রণয়ন করতো। কাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে সেই বাড়ি, জমি ইত্যাদি দখল করতে হবে–সে সব পরিকল্পনাও করেছে তারা। আর, পরিকল্পনাকারী হিসেবে নাম উল্লেখ করেন তিনি–জামায়াত নেতা আব্দুল হেকিম তাপাদারের।

বহু উদাহরণ দিয়েছেন আব্দুল বাতিন। এর অনেকটাই আবার উল্লেখিত হয়েছে অন্যান্যদের আলোচনায়। তাই সব ক'টি নিয়ে আলোচনা করছি না এখানে। আব্দুল বাতিনের গ্রাম খাসা। সে গ্রামে একেবারে নিজের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়–রাজাকার বাহিনী। এ পর্যায়ে এ কথাও বলেন যে রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে জামায়াতে ইসলামি বিয়ানীবাজারেও জামায়াতের নেতৃত্বে হয়েছে এর শাখা। পরিচালনা করেছে গরাই। এই যে, জামায়াত নেতা কুটুমনা, শফিক আহমেদ, তৈমুছ আলীরাই তো থানাব্যাপী রাজাকার বাহিনীকে পরিকল্পনা করতো। জামায়াত নেতা আব্দুল খালিক, আব্দুল মালিক তাপাদার (দুদু মিয়া), আব্দুল হেকিম তাপাদারদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতো সে রকম একটি পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই আব্দুল হক কুটুমনা এবং তৈমুছ আলী গিয়ে হাজির হয় তমছির আলীর বাড়িতে। তার বয়স তখন সত্তর উর্দ্ধ। এই অশতিপর বৃদ্ধও হয়ে গেলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি হুমকি। পাকড়াও করলো তাকে। একই সাথে তমছির আলীর পুত্র ছরকুম আলীও। অমানুসিক নির্যাতন করে তাদের উপর। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন তারা। হয়তো প্রাণই দিতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে যায় আরো নারকীয় একটি কাণ্ড। যে কারণে হয়তো প্রাণ রক্ষা হয়েছিল তাদের।

কুটুমনা! নাম শুনেই আঁৎকে উঠতেন সাধারণ মানুষ। আর পিলে চমকে উঠতো মহিলাদের। সাথে সিয়ান তৈমুছ হিসেবে অভিহিত জামায়াত নেতা তৈমুছ আলী। উভয়েই ছিল ভয়ংকর নারী মাংস লোভী। সাথে তাদের ক'জন বাদামি চামড়াওয়ালা সিপাহী। সংবাদটি প্রচারিত হবার সাথে সাথেই ভয়ে আতংকে কম্পমান মহিলারা গিয়েছেন আত্মগোপনে। কিন্তু রেণু বেগম তো ত্বড়িৎ নিজেকে আড়াল করতে অপারগ। কারণ তিনি তখন কটি সন্তানের জননী। সন্তানদের অরক্ষিত রেখে নিজে আত্মগোপন করবেন! ভাবাও যায় না। তাই, তাদেরকে সাথে করে নিয়ে পালাতে একটু দেরি হয়ে যায়। ফলে, দৃষ্টিতে পড়ে যান কুটুমনার। আর, যায় কোথায়? পাকড়াও করে তাকে। তারপর প্রকাশ্য দিবালোকে ধর্ষণ করে তারা উপর্যুপরি।

খাসা গ্রামের বাসিন্দা নছিব আলী। সেখানেও হাজির হয় এক দিন রাজাকার বাহিনী। সাথে পাকসেনাও। তবে, সেদিনের অভিযানে নেতৃত্ব ছিল থানার প্রধান দালাল, থানা শান্তি কমিটির আহবায়ক বচন হাজীর। নছিব আলীর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ান তিনি–বিজয়ী বাহিনীর সেনাপতির ন্যায়। পর্যবেক্ষণ করলেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা। তার পর জারি করেন নির্দেশ, 'দাও, আগুন দাও বাড়িতে। পুড়িয়ে ছাই করে

দাও বাড়ি।' এরপর তো এক মুহূর্ত দেরি হবার কথা নয়। ছাই-ভস্মে পরিণত হয়ে গেল নছিব আলীর শখের বাড়িঘর। একই সাথে পুড়ে যায় সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি।

ফুরকান আলী মাস্টার নিজেই ধরে দিয়েছিল জামাল উদ্দিনকে। সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এ বিষয়টি জানিয়েছেন আরো অনেকে। তাই এখানে হুবহু উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না।

আব্দুল বাতিন জানান, রাস্তা থেকেই তাকে আটক করেছিল এই কুটুমনা-তৈমুছ আলীর বাহিনী। তারপর লাঞ্ছিত করে শারীরিকভাবে। সে স্মৃতি বহন করে চলেছেন আজো।

ফরিদ, রাজ্জাক ও সায়ীদ : কমান্ডার জেলা পর্যায়ের

জেলা পর্যায়ের ছাত্র সংঘ নেতা এবং আল-বদর কমান্ডার কারা জানার চেষ্টা করি–একজন আল-বদর কমান্ডারের নিকট থেকে। থানা পর্যায়ের ছাত্র সংঘের নেতা এবং আল-বদর কামন্ডার আবুল কালাম আজাদ প্রথমেই সংশোধন করে দেন আমার প্রশ্ন। বললেন, ছাত্র সংঘ এবং আল-বদরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ছাত্র সংঘের যারা সদস্য ছিল–তাদের সবাইকে অফিসিয়ালি আল বদর বাহিনীর সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। একাত্তর সালে ছাত্র সংঘ বলে আলাদা কিছুই ছিল না। মূল দল জামায়াতের নির্দেশে এবং ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনকে একটি সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীই আমাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আর কেন্দ্রে, জেলায়, থানায়–যেখানে যিনি যে পর্যায়ের নেতা ছিলেন, তিনি-ই হন সে পর্যায়ের কমান্ডার। যেমন সিলেটে কমান্ডার ছিলেন ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী (সাংসদ)। তারপর পর্যায়ক্রমে আবু সায়ীদ, আব্দুর রাজ্জাক (ব্যারিস্টার), ওমর আলী, আবুল বাছিত প্রমুখ। ছিলেন আফজাল চৌধুরীও। তবে, আমরা বিয়ানীবাজারের লোক হিসেবে গর্ব করতাম আব্দুর রাজ্জাককে নিয়ে। কারণ, তিনি আমাদের থানার সন্তান। পার্শ্ববর্তী থানায় জন্ম ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী এবং আবু সায়ীদের। এর মধ্যে ফরিদ উদ্দিন নাম্বার ওয়ান। সমস্ত কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করতেন আবু সায়ীদ। কারণ, তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী ছাত্র। ২৯ দিনে কোরান শরীফ মুখস্থ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন।'

আবুল কালাম আজাদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন জেলা ব্যাপি আল-বদর বাহিনীর উপর প্রভাব ছিল আবু সায়ীদের। আর, সিলেট মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে প্রতিষ্ঠিত আল-বদর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তার উপর। 'এসব দায়িত্ব পালনও করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে' যোগ করেন তিনি। বিয়ানীবাজারে কে কে ছিলেন আল-বদর কমান্ডার এবং কারা তাদেরকে সে দায়িত্ব আসীন করেছিলেন? জানতে চাই আবুল কালাম আজাদের কাছে। উত্তরে আগের দেয়া

বক্তব্যই পুনরুল্লেখ করে বলেন, 'ছাত্র সংঘের সকল সদস্যইতো আল-বদর হয়ে যাই। সংগঠনটির নেতারা আসতেন প্রায়ই। গাইড লাইন দিতেন আমাদেরকে।

জেলা পর্যায়ের কোনো কোনো নেতারা বেশি আসতেন মানে এই থানার দেখাশোনা বা বদর বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব কার উপর ছিল বলে মনে করেন? উত্তরে, বলেন, 'ফরিদ উদ্দিন তো জেলার মূল কমান্ডার হিসেবে সর্বত্রই যেতেন। আসতেন এখানেও খুব ঘন ঘন। পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা আবু সায়ীদও আসতেন প্রায়ই। আর, নিজের থানা হিসেবে আব্দুর রাজ্জাকের ছিল অতিরিক্ত দায়িত্ব। তারা সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে–ইসলাম ও পাকিস্তানের স্বার্থে।'

আপনি নিজেও ইসলামি ছাত্র সংঘের একজন নেতা ছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই সে সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পরে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও সংগঠনের মনোনয়য়ন লাভ করেছিলেন। আপনাকে কেন থানা কমান্ডার করা হয়নি-বলতে পারেন? বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'না-না আপনার কথা ঠিক নয়। আমি ছাত্র সংঘের নেতা ছিলাম এবং আল-বদর বাহিনীর কমান্ডার করা হয় আমাকে। অন্য নেতারাও যেমন আব্দুল কাদির মজনু এবং ফজুলুল হকও কমান্ডার ছিলেন।'

বদর বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে নানা জায়গায় যেতে হতো আপনাদেরকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কোনো কোনো কর্মকর্তার সাথেও হয়তো সাক্ষাৎ হয়েছে। আছে এ রকম কোনো স্মৃতি? গর্ব করে বলেন, 'দেখুন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার ছিলেন জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ্ খান নিয়াজী। সিলেট আসলে–তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছিলাম মজুন, ফজুল এবং আমি। জেলা পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের সঙ্গে তো হর-হামেশাই দেখা সাক্ষাৎ ঘটতো।

আচ্ছা, এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কিংবা অন্য কোথাও ব্যবহার করার জন্যে কি কোনো পরিচয় পত্র দেয়া হয়েছিল? এ যেন আরেকটি গর্বের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া। খুঁজে বের করে আনেন তার পরিচয় পত্রটি। সযত্নে আগলে রেখেছেন সেটি। নিজের হাতে রেখেই প্রদর্শন করেন আমায়। বলেন, 'ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানা স্বাক্ষরিত আই-ডি কার্ড। তারপর একটু হেসে বল্লেন, 'লুকিয়ে তো রেখেছি ২৩ বছর ধরে। তবে, একদিন আবার এই আইডি কার্ড বহন কারীরাই হবেন নমস্য। সে দিনের অপেক্ষায় আছি।'

সভা-সমাবেশগুলো কোথায় করতেন? 'আমাদের দিক নির্দেশনামূলক সভাগুলো করতাম রুদ্ধদ্বার কক্ষে। সেগুলো অনুষ্ঠিত হতো বাজারের আমির মার্কেটে। আবার, পাবলিক মিটিং করতাম ডাকঘরের নিচে।' এভাবেই কথা বলেন তিনি।

আপনাদেরকে কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল? আবুল কালাম আজাদের

উত্তর–'আপনার কি মাথা খারাপ। আমরা ছিলাম সামরিক বাহিনীর একটি অংশ। প্রশিক্ষণ ছাড়া কি করে যুদ্ধ করবো? আমরাও নভেম্বর মাসে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।'

জাতির আশা আকাঙ্খার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। যুদ্ধও করেছেন। এর জন্য কি কষ্ট হয় না? এবারে ক্ষুব্ধ হয় আজাদ বললেন, 'জাতির নিরুদ্ধে নয়–আমরা ছিলাম জাতি এবং ইসলামের পক্ষে। যারা ভারতে গিয়েছিল–তারাই বরং জাতির বিরুদ্ধে ছিল। অপেক্ষা করুন -একদিন প্রমাণিত হবে কারা ধারণ করেছিল জাতির আকাঙ্খাকে। আমারাতো আওয়ামী লীগের ন্যায় হিন্দুর ক্রীড়নক হতে চাই না।'

আবুল কালাম আজাদ জানান, রাজনৈতিক প্রতিকূলতার কারণেই দেশ ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী হয়েছিলেন। তবে, সেখানেও দলের কাজ করেছেন। যোগাযোগ ছিল দেশেও। দলের জন্যে তহবিল সংগ্রহেও বিশেষ ভূমিকা ছিল তাদের। দেশে আসার পর পরই যোগাযোগ হয়ে যায় সবার সঙ্গে। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, আবু সায়ীদ, ওমর আলী, আব্দুল বাছিতরা ছিলেন নেতা। এখনো আছেন। ভবিষ্যতেও থাকবেন। তাদেরকে নিয়ে যারা প্রগাগান্ডা করেন–তাদের ধ্বংস অনিবার্য।'

অঞ্জলির ধর্ষকরাও থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

গোলাপগঞ্জ থানার বিখ্যাত ভাদেশ্বরের খুলিয়া গ্রাম। সেখানেই বাস করেন প্রাইমারি শিক্ষক যতীন্দ্র বিশ্বাস। গ্রামের বাইরে এ নামটির সাথে তেমন পরিচয় নেই কারো। চেনার কোনো কারণও নেই। কিন্তু পরিচিত গড়ে উঠেছে স্ত্রীর নামে। সে পরিচয়েই জানে এখন সবাই। তা হলে কে তার স্ত্রী? কোনো অসাধারণ মহিলার স্বামী তিনি।

না, স্ত্রী-ও ছিলেন অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে। তাকেও চেনার মতো কোনো কারণ–হয়তো থাকতো না। গরিব পিতা-মাতা। সাধ থাকলে ও সাধ্য তেমন একটা ছিল না। তবুও মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন উচ্চ বিদ্যালয়ে। জলঢুপ হাইতি গ্রাম থেকে দূরেও নয় জলঢুপ উচ্চ বিদ্যালয়। পারে হেঁটে যেতো স্কুলে–সবারই মতো। কিন্তু তার জন্যে ছিল কিছু সমস্যা। সে ছিল খুবই সুন্দরী। গানের গলাও ভালো। চলন-বলন–সব মিলিয়ে চমৎকার। আর এই চমৎকার হওয়াটাই তো ওর জন্যে কাল। গরিবের ঘরে সুন্দরী মেয়ে হলে কিংবা গরিব-ঘরের ছেলে সুন্দরী স্ত্রী থাকলে বিপদে পড়তে হয়। লড়াই বিশ্বাসেরও হলো তাই। বিয়ানীবাজার থানার লাউতা ইউনিয়ন পরিষদের জলঢুপ-হাইতি গ্রামের এই গরিব লোকের মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি পড়ে অনেকেরই। তাছাড়া ঐ এলাকায় ছিল জামায়াতে ইসলামিরও দু'চার জন নেতা। তা হলে আর, নিরাপদ থাকবে কেমন করে–লড়াই বিশ্বাসের মেয়ে অঞ্জলি। রাস্তায় তাকে বিরক্ত করতো অনেকেই। এমন কি মজির উদ্দিন নামে একজন স্থানীয় মুসলীগ লীগ নেতাও। জোর করে অঞ্জলিকে ভোগ করেছেন তিনি। এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন

এলাকার লোকজন, অঞ্জলির শিক্ষক, শান্তি কমিটির সদস্য, রাজাকার কমান্ডার এমন কি অঞ্জলির মাও। এ নিয়ে সালিশ বিচারও বসেছিল এলাকায়। এর মধ্যেই শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। বিয়ানীবাজারে আসে হায়েনা। পালের গোদা ইফতেখার হোসেন নামক একজন পাকসেনা। পদবীতে ক্যাপ্টেন। ছোট একটি নাম ছিল তার গণ্ডল। সে নামেই চিনতো সবাই।

পাতন গ্রামের মজিরউদ্দিন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতা। শান্তি কমিটিরও সদস্য। সে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করবে অঞ্জলি বিশ্বাসের সাথে–ভোগ করবে তাকে? আর, জামায়াত নেতা আব্দুল হক কুটুমনা বসে বসে কি আঙ্গুল চুষবে? মজির উদ্দিন অপেক্ষা শান্তি কমিটিতে প্রভাব তার অনেক বেশি। লাম্পর্ট্যে চ্যাম্পিয়ন গণ্ডলেরও প্রিয় সে। তা হলে অপেক্ষা কিসের। তাছাড়া কুটুমনা মুসলিম লীগ নয়–জামায়াত। অতএব রাখ-ঢাক করারও প্রয়োজন নেই তার। তুলে নিয়ে আসে অঞ্জলিকে–পুরো পরিবার সুদ্ধ।

শুরু করে নাটক। সে নাটকের এক একটি অংক–এক-এক ধরনের। প্রথম অংকে রাজাকার বাহিনী দিয়ে তুলে আনার পর ডাক বাংলোতে মঞ্চস্থ হলো দ্বিতীয় অংক। তাদের মতে বিধর্মীকে ইসলামের পথে আনা। অর্থাৎ মুসলমান করে নেয়া। আর, অসহায় লোকগুলো তখন প্রাণের ভয়ে সব অন্যায় অবিচার মেনে নিচ্ছিল। জন্ম থেকে যে ধর্মের বিধি বিধান মেনে এসেছে সেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে হবে। সমাপ্ত হলো সে অনুষ্ঠান। এর পর অঞ্জলি ব্যতীত সবাই হলো মুক্ত। কিন্তু নাটক তো সমাপ্ত হয়নি। পর্দা পড়তে অনেকটাই বাকি। একাধিক অংক জুড়ে ছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। কলমা পড়ে কবুল করে কুটুমনা। আর, সে বিয়েতে উপস্থিত ছিল ক্যাপ্টেন ইফতেখার হোসেন গণ্ডল। শান্তি কমিটির সদস্য আব্দুল হেকিম তাপাদার, ডা. মঈন উদ্দিন আহমদসহ অন্যান্যরা। সাক্ষী হলেন সবাই। কিন্তু অঞ্জলিকে রাত্রি যাপন করতে হলো গণ্ডলের সঙ্গে। বলা হয়েছিল ক্যাপ্টেন গণ্ডল নাকি তাকে বিয়ে করেছে। না, সেখানেও যবনিকাপাত ঘটেনি। অঞ্জলিকে কুটুমনা আবার নিয়ে যায়–তার কাছে। এর আগেই সুপাতলার ঘোষ পরিবারের সবাইকে হত্যা করে বাড়িটি দখল করেছিল। সে বাড়িতেই নিয়ে রাখে অঞ্জলিকে। একেই বলে জামায়াতে ইসলাম।

থানা শান্তি কমিটিতে আব্দুল হক কুটুমনার এবং মজিদ উদ্দিনের সহকর্মী মছদ্দর আলী মষট্টি। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন–অঞ্জলির সাথে মজির উদ্দিনের ছিল অবৈধ সম্পর্ক। তবে, এলাকাবাসী জানান, এ রকম আরো অনেক ঘটনার জন্ম দিয়েছেন মজির উদ্দিন। মানুষের মুখে মুখে এখনো ফেরে এ সব কথা। শান্তি কমিটির অপর সদস্য মাওলানা ছমির উদ্দিনও সমর্থন করেছেন এ বক্তব্যকে।

লড়াই বিশ্বাস এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাননি। জলঢুপ-হাইতি গ্রামে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সহযোগী আব্দুল মালিক ফারুক ও ফরিদ আহমদ

নান্নুসহ। অঞ্জলির যা কথা বলেছেন আমার সাথে। তিনি জানান, একাত্তর সালে সে ছিল জলঢুপ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। কিন্তু স্কুলে যাতায়াতকালে তাকে বিরক্ত করতো কিছু জেলে। এ নিয়ে কিছু লোকের সঙ্গে তাদের মনোমালিন্যও হয়েছিল। 'ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যানও মেয়েটিকে উত্যক্ত করতেন। ফলে, আমরা বিরাট সমস্যায় পড়ে যাই। এ নিয়ে বিচারও হয়েছে। এভাবেই বর্ণনা করছিলেন মহিলা। তিনি বলেন, 'কোনো এক দুপুরে পাকিস্তানি আর্মি ও রাজাকারের বিরাট এক গ্রুপ এসে হাজির হয় বাড়িতে। ধরে ধরে বাড়ির সবাইকে বেঁধে ফেলে ওরা। তারপর নিয়ে যায় বিয়ানীবাজার। ডাকবাংলোয় রাখে আমাদেরকে তিন রাত। তারপর কি মনে করে আমার দু'মেয়েকে রেখে অন্য সবাইকে ছেড়ে দেয়। এ সময় কান্নাকাটি করে আমার স্বামী ক্যাপ্টেন গগুলের কাছে কাকুতি মিনতি করে চেয়ে নেন ছোট মেয়ে অনিতাকে। কিন্তু অঞ্জলিকে আনতে পারেননি। তাকে ছাড়েনি কোনো ভাবেই।

অঞ্জলিকে মুসলমান করার কথা কিংবা কুটুমনার সঙ্গে বিয়ের বিষয়ও শুনেছেন। কিন্তু এ সব বিষয়ে কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না তাদের। স্বাধীনতার পর ফিরে পান মেয়েকে। সে তার স্ব-ধর্মই পালন করছে এখন। তারপর গোলাপগঞ্জ থানার খুলিয়া গ্রামের যতীন্দ্র বিশ্বাস তাকে বিয়ে করতে রাজি হন। অঞ্জলি আছে সেখানেই।

এই অপকর্মের বিচার চেয়ে মামলাও হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর এসব মামলা আর চলেনি। আর, সে সময় কুটুমনাদের ছিল পোয়া বারো। ক্ষমতা হয়ে উঠে একাত্তরের ন্যায় অপরিসীম। তাই ওরা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

অঞ্জলি বিশ্বাসের কথা এসেছে পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ের নিকট থেকে। আলোচিত হয়েছে নানাভাবে–ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে। কুটুমনাদের পাপাচারের বর্ণনা দিতে উল্লেখ করতে হয়েছে নামটি বার বার। তাই এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনায় যাচ্ছি না।

তবে, অঞ্জলির শিক্ষকদের বক্তব্যও পাঠকদের সামনে তুলে ধরা দরকার মনে করি। মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধান শিক্ষক ছিলেন সম্ভবত আজির উদ্দিন। কিন্তু স্কুলে যেতেন না তিনি নিয়মিত। দায়িত্ব পালন করতেন আকমল আলী। পরে তিনি-ই হন জলঢুপ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ১৯৯৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি স্কুলেই দেখা করি তার সঙ্গে। নাম বলতেই চিনে ফেললেন–অঞ্জলি বিশ্বাসকে। কিন্তু কোনো শ্রেণীর ছাত্রী ছিল সে? বললেন ৯ম বা ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী। নিশ্চিত মনে নেই। এত বছর আগেকার রেকর্ডও খুঁজে পাওয়া কঠিন। 'তবে, অঞ্জলি ছিল আমার ছাত্রী। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী। হয় ৯ম বা ১০ম শ্রেণীতে পড়তো সে। মেয়েটিকে মনে রাখার অনেক কারণ আছে। ভুলবও না তাকে কখনো। এসব কথাই বলছিলেন প্রধান শিক্ষক আকমল আলী। মুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়োরম্যান মজির উদ্দিন মেয়েটির সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে। যা নিয়ে এলাকায় নালিশ বিচারও হয়েছে।

পরের ঘটনাও বর্ণনা করেন তিনি এভাবে 'বিয়ানীবাজার থেকে রাজাকার ও আর্মি

এসে ধরে নিয়ে যায় তাকে। এ ঘটনায় সহায়তা করেন পাখি দারোগা। কিন্তু অঞ্জলিকে একা নয়। নিয়েছিল পুরো পরিবারসহ। সবাইকে মুসলমান করে ক্যাপ্টেন ইফতেখার হোসেন গণ্ডল। মেয়েটির পিতার নাম দিয়েছিল সাহাব উদ্দিন। ওরা একটি বিয়ের নাটকও করে। বিয়ে হয় কুটুমনার সঙ্গে।' জানতে চাই–বিয়ের নাটক বলছেন কেন?

আকমল আলী বলে চললেন–'নাটক নয়তো কি? বিয়ে করলো কুটুমনা! কিন্তু পর্যায়ক্রমে তাকে নিয়ে রাত্রি যাপন করতো গণ্ডল ও কুটুমনা। এটা কোনো ধরনের বিয়ে? কোনো ধর্মে তা অনুমোদন দিয়েছে? এই যে ইসলাম- ইসলাম বলে বেড়াতো ওরা এসব কি ইসলামের নমুনা?' তারপর কি হয়েছিল ওদের? 'এক সময় দেশ স্বাধীন হলো। মুক্তিসেনারা গোলাপগঞ্জ থেকে আটক করে কুটুমনাকে। সাথে ছিল অঞ্জলিও। মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়ে যায় তার বাড়িতে। কি হবে তার? পড়া-শোনা তো আর হবে না। সমাজের বলি সে। এবারে একটা বিয়ে দিতে হয় তাকে। বাবা মা যেন তাকে নিয়ে মহাবিপদে। কোনো রকমে বিদেয় দিতে পারলেই বাঁচেন। কিন্তু কোথায় পাবে জামাই? দয়া করে কে তাকে বিয়ে করবে? গোলাপগঞ্জ থানার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের খুলিয়া গ্রামে অঞ্জলির ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ি। অঞ্জলির তালই মানে তার ভাইয়ের শ্বশুর যতীন্দ্র বিশ্বাস। পিতার সমান বয়স এবং সম্পর্কেও পিতৃতুল্য। বিয়ে করতে রাজি হন সেই যতীন্দ্র বিশ্বাস। এসব স্মরণ করতেও কষ্ট হয়।' এভাবেই বলে যান অঞ্জলির শিক্ষক আকমল আলী।

পথ পদর্শক

জলঢুপ একটি গ্রাম। কিন্তু নাম তার দেশ জোড়া। জলঢুপি আনারস এবং কমলার জন্যে সারা দেশের মানুষের কাছে পরিচিত গ্রাম বা এলাকাটি। সে এলাকায়ও ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পা চাটা দালাল। শান্তি কমিটি ছিল ইউনিয়ন পর্যায়েও। তাছাড়া থানা শান্তি কমিটিরও সদস্য ছিল অনেকেই। সমগ্র থানা জুড়ে যুদ্ধাপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সে এলাকারও বহু দালালের ভূমিকা ছিল।

জলঢুপ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, তাদের সে এলাকা-জলঢুপে পাকিস্তানি সেনা সদস্যদের প্রথম নিয়ে যান থানা শান্তি কমিটির আহবায়ক আব্দুর রহিম বচন হাজী এবং সেক্রেটারি আব্দুল খালিক তাপাদার দুদু মিয়া। সাথে ছিল আরো ক'জন দালাল। এর মধ্যে মজম্মিল আলী কালামিয়া, মজির উদ্দিন, ময়না মিয়া ও ফয়জুর রহমান অন্যতম। তিনি জানান শ্রীধরা গ্রামের ফয়জুর রহমানই মোটর সাইকেলে করে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে যান পুরো বাহিনীকে।

মোটর সাইকেলের পেছনে ছিল সামরিক জিপ। তাতে পাকবাহিনীর অধিনায়ক–ক্যাপ্টেন ইফতেখার হোসেন গণ্ডল এবং শান্তি কমিটির আহবায়ক বচন হাজী। অন্যান্য যানে পাকসেনা, রাজাকার এবং অন্যান্য দালালরা। দুদু মিয়া শান্তি

কমিটির সেক্রেটারি। খাসারিপাড়া গ্রামের মজম্মিল আলী কালা মিয়া–থানা শান্তি কমিটির সদস্য, মুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মজির উদ্দিন (পাতন) থানা শান্তি কমিটির সদস্য। আর ময়না মিয়ার বাড়ি কালাইউরা গ্রামে। লাউতা ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ড শান্তি কমিটির আহবায়ক।

তারা সবাই গিয়ে হাজির হন জলঢুপ এলাকায়। বচন হাজী ঘোষণা করেন–তারা অপারেশন চালাবেন। হ্যাঁ, অপারেশন চললো পাড়িয়া বহর গ্রামে। সে গ্রামেই বাস করতেন প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার ডা. নিশি কান্ত ভট্টাচার্য। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই চলে যান তিনি ভারতে। বাড়িতে রেখে যান ছেলে ভূষণ ভট্টাচার্য এবং দু'জন কেয়ারটেকার। পাওয়া গেল কেয়ারটেকারদের। প্রাণের বিনিময়ে হলেও নিশি বাবুর সহায় সম্পত্তি রক্ষায় তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই পাক সেনাদের দেখেও পালাননি কোথাও যদিও ভূষণ ভট্টাচার্য পালিয়ে গিয়েছিলেন দূরে-বহু দূরে খেসারতও দিতে হলো কেয়ারটেকারদের। প্রাণ কেড়ে নিলো তাদের। আকমল আলী বলেন, এ দু'জন নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির প্রাণ কেড়ে নিয়েছেন বচন হাজী ও ফয়জুর রহমান।

স্বাধীনতার পর ডা. নিশিকান্ত ভট্টাচার্য দু'জন কেয়ারটেকার হত্যার জন্যে এদের বিরুদ্ধে মামলাও করেছিলেন। এ দু'জন শহীদের নাম পরিচয়ে হলো–মহিব আলী, মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানাধীন নিজ বাহাদুপুর গ্রামের সন্তান। অন্যজনও মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল থানার কোনো একটি চা বাগানের শ্রমিক শ্রীমান দাস।

শামসুদ্দিন ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। দেশের ভেতরে আসার পর তাদের ধরে নিয়ে অমানুসিক নির্যাতন করেছে এরা। আর, পাকসেনা ওদের বাঙালি দালাল-রাজাকারদেরকে জলঢুপে সেদিন অভ্যর্থনা জানান স্থানীয় দালাল মছব্বির খান। লাতিয়াবহর গ্রামে তার বাড়ি। পরে বি.এন.পির স্থানীয় নেতা।

মাথিউরা : দালালের বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার

বাউল শিল্পী কমর উদ্দিন। এক নামে চিনতো দু'থানার লোকজন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে গান পরিবেশন করে ফিরেছেন আওয়ামী লীগের জনসভাগুলোতে। একটি জাগরণ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেছেন-যথাযথভাবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকালে দেখা দেয় তার জীবনাশংকা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষের প্রতিটি লোকেরই ছিল সে আশংকা। তাই, নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যান আত্মগোপনে। বিভিন্ন গোপন আস্তানায় কাটাতে হয়েছে তার সময়। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না তার।

গোলাপগঞ্জ থানার আমকোনা গ্রাম থেকে ধরা পড়ে যান কমর উদ্দিন। নিয়ে আসা হয় তাকে বিয়ানীবাজারে। হাজির করা হলো ক্যাপ্টেন ইফতেখার হোসেন গণ্ডলের সামনে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি বিরোধী এবং আরো নানা অভিযোগ উত্থাপন করা হলো তার বিরুদ্ধে। কিন্তু ক্যাপ্টেন গণ্ডল সব

শুনে এবং তার সূরা সদস্যদের কারো কারো মতামত নিয়ে ছেড়ে দেয় তাকে। কমর উদ্দিনও রওয়ানা করেন মাথিউরা গ্রামে–নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে।

কমর উদ্দিন মুক্তি পেয়েছেন। চলে যাচ্ছেন নিজ বাড়িতে। সংবাদটি পৌঁছে তার গ্রামের এক জামায়াত নেতা এবং থানা শান্তি কমিটির সদস্য জামিল রেদওয়ান-বোরখা হাজীর কাছে। তাৎক্ষণিক টেনে নেন কাগজ-কলম। ক্যাপ্টেন গন্ডলের উদ্দেশ্যে লিখলেন অতি জরুরি চিঠি। রাজাকার মারফৎ পাঠালেন তা ডাকবাংলোয়। আর, সে পত্র পাঠ করেই রাস্তা থেকে আবার ধরে আনায় কমর উদ্দিনকে। সাথে সাথেই পাঠিয়ে দেয় বধ্যভূমিতে। হয়ে গেলেন তিনি স্বাধীনতার বলি। সেদিন ছিল একাত্তরের ১৯ সেপ্টেম্বর।

কমর উদ্দিনের মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী? প্রশ্ন করেছিলাম থানা শান্তি কমিটিরই অপর সদস্য মাওলানা ছমির উদ্দিনকে। এক মুহূর্তও দেরি না করে উত্তর দিলেন। 'জামিল রেদওয়ান-বোরখা হাজী'। আর, রাজাকার কমান্ডার মছদ্দর আলী মযম্ভি তার এ বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, 'মাথিউরা ইউনিয়নে হত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ সবই সংঘটিত হয়েছে বোরখা হাজী, মহছিন আলী ও জামাল মাস্টারের পরিকল্পনা মতো।' তিনি আরো জানান, 'কমর উদ্দিনকে আমকোনা থেকে ধরে আনে জামায়াতে ইসলামির একজন লোক। তারপর বোরখা হাজীর নির্দেশেই তাকে হত্যা করা হয়।

১৯৯৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি আরো জানার জন্যে হাজির হই মাথিউরা গ্রামে। প্রধান কথা সাহিত্যিক এবং মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক আকাদ্দম সিরাজুল ইসলামের (মরহুম) সাক্ষাৎকার নেই এ বিষয়ে। এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা আতাউর রহমান খান। সাংবাদিক খালেদ জাফরীসহ আরো অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। পাওয়া গেল মহেন্দ্র দাসদের বাড়িতে সংঘটিত নারকীয় কাণ্ডের নানা বর্ণনা। ঐ বাড়ির মেয়ে জ্যোৎস্না এবং কল্পনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় রাজাকার বন্দে আলী এবং তার বাহিনী। ভালো নাম তার শামসুদ্দিন। সেই মহেন্দ্র দাসরা এখন কোথায়? সে ঠিকানাও পাওয়া যায় গ্রামবাসীদের কাছে।

মাথিউরা গ্রামের অনেকেই জানালেন পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক মুজাহিদ আলী খান নিগৃহীত হবার কাহিনী। আর, সাংবাদিক খালেদ জাফরীর সহায়তায় বাড়িও খুঁজে পেলাম তার। পেয়ে গেলাম তোরাব আলী খানকে। মুজাহিদ আলী খানের পুত্র। জানালেন–তার পিতা ছিলেন আওয়ামী লীগের কর্মী। সে কারণেই হয়তো জুন মাসের কোনো এক সকালে বাড়িতে আসে ১০ জনের মতো পাকিস্তানি আর্মি। পথ-প্রদর্শক গ্রামেরই এক কুলাঙ্গার। উত্তর পাড়ার জলই মিস্ত্রী। ভালো নাম তার আব্দুল জলিল। এর আগেই যোগ দিয়েছে পাকিস্তানিদের সঙ্গে। অস্ত্রধারী রাজাকার। খুঁজতে থাকে মুজাহিদ আলী খানকে। কিন্তু তিনিতো বাড়িতে নেই। পাক সৈন্যদের দেখা মাত্রই পালিয়েছেন বাড়ি ছেড়ে। মুজাহিদ আলীকে না পেলে কি হবে? বাড়ির মালিক তো

তিনি। তা হলে সে বাড়ি পুড়িয়ে দিতে হবে। পরিবার সুদ্ধ সবাই কাকুতি মিনতি করে, কান্নাকাটি করে করে প্রতিশ্রুতি দিলেন মুজাহিদ আলীকে হাজির করা হবে ক্যাপ্টেনের কাছে। এ যাত্রা রক্ষা হলো বাড়ি। কিন্তু মাথিউরা ইউনিয়নে পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালি দালালরা নাখোশ হলো ভীষণভাবে। ছুটে যায় তারা পাকিস্তানি সেনা অধিনায়কের কাছে পুনঃঅভিযোগ মুজাহিদ আলী খানের বিরুদ্ধে। কিন্তু কারা সেই দালাল? তোরাব আলী খান জানান, জামায়াতে ইসলামির নেতা জামিল রেদওয়ান-বোরখা হাজী এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মতছিম আলীর চক্রান্তে তার পিতাকে ধরে নিয়ে অমানুসিক নির্যাতন করা হয়। বাড়িও পুড়িয়েছে ওরা। লুটপাট করে নিয়ে গেছে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি। নিজেদের লাইসেন্স করা বন্দুক, সোনা, নগদ অর্থও নিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্য এবং এদেশিয় সহযোগীরা। এ পর্যন্ত কিন্তু মুজাহিদ আলী খান ওদের হাতে বন্দি। ডাক বাংলোর দু'দিন ধরে আটকে রেখে অমানুসিক নির্যাতন চালায় তার উপর। দু'দিন পর ছাড়া পেয়ে ফিরে আসেন পুড়োমাটির ভিটেয়। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই আবার আসে হায়েনাগুলো। এবার আর একা নন। তুলে নিয়ে যায় মুজাহিদ আলী খান, তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে পুত্র বধূসহ পুরো পরিবার। বন্দি হলেন সবাই ডাক বাংলোয়। মুজাহিদ আলী খানের এক ভাই তখন নানা কৌশল করে মুক্ত করান ভাইয়ের পরিবারকে। কিন্তু মুক্তি দেবার সময় ক্যাপ্টেন ইফতেখার হোসেন গণ্ডল বলেন, মতছিন আলী অভিযোগ করেছেন যে, মুজাহিদ আলী খানের কারণে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

সিরাজ উদ্দিনের স্ত্রীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসে পাকিস্তানি সৈন্যরা। কিন্তু কেন? এর উত্তরও দিয়েছেন থানা শান্তি কমিটির সদস্য এবং রাজাকার কমান্ডার মছদ্দর আলী মষট্টি। তার মতে জামিল রেদওয়ান বোরখা হাজী, মতছিন আলী এবং জামাল মাস্টারই এর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সিরাজ উদ্দিনকে না পেয়ে নিয়ে আসে তার স্ত্রীকে। আর, স্ত্রীকে মুক্ত করার জন্যে সিরাজ উদ্দিন এসে আত্মসমর্পণ করেন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের কাছ। পরিণতিতে প্রাণ দিতে হলো তাকে।

শুধু এ দু'টি ঘটনা মাত্র নয়–কথা সাহিত্যিক আকাদ্দম সিরাজুল ইসলামের বাড়ি পুড়ানোসহ প্রত্যেকটি ঘটনার জন্যেই এই দালালরা দায়ী। মছদ্দর আলী মষট্টি আরো জানান, মাথিউরা ইউনিয়নে আব্দুল হাসিব এবং আব্দুল লতিফ হত্যা, তাহির আলী, রফিক উদ্দিন, জিয়া উদ্দিন, তাজ খান ও নূর উদ্দিনসহ অসংখ্য মানুষকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করার জন্যে দায়ী উপরোক্ত তিন দালাল।

স্বাধীনতার পরও এই দালালদের দাপট ছিল আকাশ চুম্বি। ১৯৭৩-৭৪ সালে মতছিন আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় রক্ষী বাহিনী। উদ্ধার করে প্রচুর অস্ত্র। গ্রেফতার করেছিল মতছিন আলী, তার ভাই মতছির আলী, ছেলে জালাল ও মইন এবং ভাতিজা (মতছিন আলীর ছেলে)।

ভয়ে শফিকের নাম বলে না কেউ

বিয়ানীবাজার থানার দেউলগ্রাম, গোবিন্দশ্রী প্রভৃতি জায়গায় সংঘটিত হয়েছে বহু নারী নির্যাতনের ঘটনা। হত্যা করা হয়েছে কাউকে কাউকে। আর শারীরিক নির্যাতনের শিকার অগুণতি মানুষ। বাড়ি লুট, সম্পত্তি দখল, অগ্নি সংযোগসহ অসংখ্য অপরাধ কর্ম সংঘটিত হয়েছে সে সময়। এর কিছু কিছু উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিছু হয়নি। দুঃখজনক হলো যে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা পর্যন্ত এখন আর কথা বলতে চান না। বললেও কোনো বাঙালি কুলাঙ্গারের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে অপরাধ কর্ম, কারা সে সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল, এমন কি নিজের বাড়িটি কার নির্দেশে কে দখল করেছিল লুটপাট করে নিয়েছিল–সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বা ভস্মিভূত করেছিল অগ্নি সংযোগে–সে তথ্যও প্রকাশ করতে রাজি হন না। ছিঁটে ফোঁটা কিছু বললেও-এর আগে ডানে বায়ে চেয়ে নেন বার বার–কেউ কি আছে আশেপাশে? কিন্তু কেন এর জবাব পাইনি কখনো কারো কাছেই।

রাজাকার আনই-মনইয়ের বাড়ি চারখাই। ওরা গোবিন্দশ্রীতে এসে ধরে নিয়ে যায় অনিমা পুরকায়স্থকে। লুটপাট হয়েছে ঐদিন হত্যা, অগ্নি সংযোগ, নির্যাতন কোনোটাই বাদ যায়নি। কিন্তু এটা কি শুধুই আনই মনইয়ের পরিকল্পনা। ঐ এলাকার কোনো দালাল কি জড়িত ছিল না? এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি অনেকেই। কেউ কেউ বলেছেন মিন মিন করে শফিকের নাম। আবার কেউ থেকেছেন নিশ্চুপ। এ ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম থানা শান্তি কমিটির সদস্য এবং রাজাকার কমান্ডার মছদ্দর আলী মষট্টির কাছে।

মষট্টি তো শান্তি কমিটির লোক। একই কমিটিতে ছিল শফিক আহমদ বা ফয়জুল হকও। দু'জনই রাজাকার কমান্ডার এবং একে অন্যের সম্পর্কে ভালো জানার কথা। তিনি উত্তরটা এড়িয়ে যেতে চান প্রথমে কিন্তু পাশে বসা রফিক উদ্দিন তোতা মিয়া বললেন সরাসরি উত্তর দিতে হবে। এবারে মুখ খুললেন তিনি। জানালেন, 'গোবিন্দশ্রীর হত্যাকাণ্ড এবং নারী নির্যাতনের ঘটনায় সরাসরিভাবে যুক্ত শফিক আহমদ। তার অনুমোদন না থাকলে সেখানে আসতে পারতো না আনই-মনই।' কিন্তু এলাকাবাসী কিছুই বলছে না কেন? 'ভয়ে বলে না কেউ কিছু।' মষট্টি বললেন, শফিক মাঝেমধ্যে দেশে আসে। তার দল জামায়াতে ইসলামিও খুবই সংহত। তাই, এলাকার লোকজন সাংঘাতিক ভয় করে তাকে। শফিকের নাম বলে না কেউ। তিনি আরো জানাল, শফিকের দাপট এতটাই প্রকট যে, তার দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কেবল তার নাম শুনেই শিউরে উঠে লোকজন। তবে, সে যদি জামায়াত না করতো কিবা জামায়াতের বর্তমান অবস্থান না থাকতো–তা হলে মানুষ এতটা ভয় করতো না।

পাকিস্তান থেকেও সে বিয়ানীবাজার থানার এক বিরাট এলাকা জুড়ে আতংকের কারণ হয়ে আছে। একাত্তরের শহীদদের পরিবার কিংবা ক্ষতিগ্রস্থরাও তার ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠে।

বাড়ি পুড়িয়েছে ফুরকান আলী মাস্টার

বিয়ানীবাজার থানা আওয়ামী লীগের এক নেতা ফৈজুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনেও রয়েছে তার ভূমিকা। বাড়ি মুড়িয়া ইউনিয়নের বড়দেশ গ্রামে। একাত্তরের সেই ভয়াবহ দিনে আক্রান্ত হয়েছে তার নিজের বাড়ি। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা খুঁজেছে তাকে। না পেয়ে নারকীয় তাণ্ডব চালায় বাড়িতে।

১৯৯৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালেই পৌঁছাই তার বাড়িতে। পাক বাহিনী কর্তৃক তাদের এলাকায় সংগঠিত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানতে চাই তার কাছে। শুরুতেই জানান, 'বড়দেশ গ্রামে ওরা পুড়িয়েছে অনেকগুলো বাড়ি। এর মধ্যে আছে আমার নিজের বাড়িও। এছাড়াও মছদ্দর আলী, আমির উদ্দিন, কুতুব আলী, আব্দুল হাছিব, আব্দুর রউফ, তাহির হোসেন খান, পাকদ্দছ আলী, মকদ্দছ আলী, সদর আলী ও হাজী দিপত আলীর বাড়ি পুড়িয়েছিল।'

কিন্তু পাকিস্তানিরা কিভাবে জানলো—কারা আওয়ামী লীগের নেতা, কারা পাকিস্তানের শত্রু এবং কাকে হত্যা করতে হবে। কার বাড়িই বা পুড়ানো দরকার। আর এসব লোকের বাড়ি ঘর সনাক্ত করলো কিভাবে এ প্রশ্নের উত্তরে ফৈজুর রহমান জানান—পাকিস্তানি সৈন্যরা কোথাও হঠাৎ করে যায়নি—গিয়েছে পরিকল্পনা অনুযায়ী। আর, এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দিতো তাদের এদেশীয় দালালরা। যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলেও ছিল বাঙালি জাতির শত্রু। বড়দেশ গ্রামেও গিয়েছে জামায়াত প্রণীত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেছে ফুরকান আলী মাস্টারসহ কয়েকজন কুলাঙ্গার। তার নিজের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছিল ফুরকান রাজাকার।

তিনি নিজে তখন বাড়িতে ছিলেন না। তা হলে কিভাবে জানলেন—ফুরকান আলী মাস্টার নামক রাজাকার তার বাড়িতে আগুন দিয়েছে? উত্তরে বলেন, 'আমার মা তাকে নিজ চোখে দেখেছেন। তিনি তাকে ভালো করেই চিনেন। তা ছাড়াও আমার ভাই মুজিবুর রহমান আত্মগোপন করে ছিল তখন পাশের বাড়িতেই। সেখান থেকে সেও প্রত্যক্ষ করেছে পুরো ঘটনা। ফুরকান আলী মাস্টারকে দেখেছে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে।' ফৈজুর রহমান আরো জানান, ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামের ইদ্রিস আলী স্বাধীনতার পর নারী নির্যাতনের মামলা করেছিলেন। দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সে মামলার একজন আসামী থানা আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতায় পরিণত হন। যা তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

এ প্রসঙ্গে আরো একজন দালালের কথা উল্লেখ করেন। পেশায় যিনি ছিলেন চিকিৎসক এবং অন্য জেলার লোক। চাকুরি সূত্রে বিয়ানীবাজারের বাসিন্দা। একাত্তরে হলেন পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর স্থানীয় অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ইফতেখার হোসেন গণ্ডলের প্রিয়জন। থানা শান্তি কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং গণ্ডলের মজলিশে সূরার সদস্য। বহু কুকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার নাম। অথচ তিনি থানা আওয়ামী

লীগের একজন নেতা। 'তা, হলে আর আওয়ামী লীগ করে কি লাভ? এখন ওরাই করুক এ দল'- এ ভাবেই প্রকাশ করেন ক্ষোভ।

সিলেটে পাঠানো হয় তালিকা

যারা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন সোচ্চার, প্রগতিশীল রাজনীতি করে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, মুক্তমনা বুদ্ধিজীবী, অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক ও বাহক এবং যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত—তাদের জন্যে একাত্তর সাল ছিল মহাবিপর্যয়ের সময়। দেশের এক সপ্তমাংশ মানুষ তো দেশ ত্যাগ করে চলে যান ভারতে। একটা বড় অংশ দেশের ভেতরেই ছিলেন উদ্বাস্তু। শহর ছেড়ে লাখ লাখ মানুষ চলে গিয়েছিলেন নিভৃত পল্লীতে। আবার বিপরীত চিত্রও দেখা গেছে কোনো কোনো স্থানে। গ্রামের কোনো কোনো লোক শহরে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন মানুষের ভিড়ে।

বিয়ানীবাজারে জামায়াত নেতারা দেশদ্রোহী হিসেবে একটি হত্যা তালিকা প্রণয়ন করে। সে তালিকা তুলে দিয়েছিল পাক সেনা কর্মকর্তার কাছে। অনুরোধ করেছে তারা—তালিকাভুক্ত সবাইকে হত্যা করার। নানাভাবে এ তালিকার সংবাদও বাইরে চলে আসছে তাই, অনেকেই চলে গেছেন ভারতে। আর, কেউ কেউ শহরে এসে নিজস্ব বাড়ি কিংবা ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন অতি সংগোপনে।

সংবাদটি অবহিত হয়ে যায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দালালরা। বিশেষ করে জামায়াত দলীয় দালালরা এসব সংবাদ সংগ্রহ করতো নানাভাবে। সে সূত্র ধরেই তৈরি করে অন্য একটি তালিকা। যারা গ্রাম ছেড়ে সিলেট শহরে অবস্থান করছে তাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে পাঠানো হয় জামায়াতের নেতৃবৃন্দের কাছে এবং ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানার বরাবরেও। দালালরা জানতো মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা হোসেন চৌধুরী সিলেট শহরে অবস্থান করছেন। ফলে, তার পিতা নজিবুল হোসেন চৌধুরীকে ধরে নিয়ে যায়। আর বাবাকে মুক্ত করার জন্যে নিজেই এসে ধরা দেন মোস্তফা হোসেন চৌধুরী।

এভাবেই হত্যার তাণ্ডব লীলায় মেতে উঠেছিল মৌলবাদি, সাম্প্রদায়িক দলগুলো। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামি।

পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা শুনতো জামায়াতের কথা

পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা শুনতো জামায়াত নেতাদের আদেশ-নির্দেশ উচ্চ মূল্য দিতো জামাতের বক্তব্যকে। নিশ্চিত করে এসব কথা বলেছেন এডভোকেট সৈয়দ আশরাফ হোসেন। ১৯৯৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি নিজ বাসায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য দেন তিনি। কিভাবে জানতে পারলেন তিনি এ তথ্য? প্রশ্ন করেছিলাম তাকে। বললেন, তার বাসার পাশেই ছিল জামায়াতে ইসলামির কার্যালয়। ১৯৬৮ সাল থেকেই অফিসে বসবাস করতেন জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা শামসুল হক,

সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা লুৎফুর রহমান এবং মাওলানা নূর উদ্দিন। পাশাপাশি বসবাস করায় প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ওদের সঙ্গে। আর, ওদের কর্মকাণ্ডকে দেখার জানারও প্রচুর সুযোগ পান তিনি।

এডভোকেট সৈয়দ আশরাফ হোসেন জানান, জামায়াত অফিসে প্রায়ই সভা বসতো। সে সব সভায় অবশ্যি কারো প্রবেশাধিকার থাকতো না। তবে, পাশের বাড়ির লোক হিসেবে শামসুল হক, লুৎফুর রহমান নূর উদ্দিনের সাথে প্রায়ই আলাপ হতো। তাদের কথাবার্তা থেকে অনেক কিছুই অনুমান করতে পারতেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ওদের সভাগুলো চলতো রুদ্ধদ্বার কক্ষে। তবে, পাকিস্তানি আর্মি অফিসাররা আসতো সভায়। এ দৃশ্য প্রায়ই পড়তো তাদের চোখে। তিনি বলেন সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের একজন ক্যাপ্টেন ওদের সাথে গোপনে সভা করতো—খুবই ঘনঘন। শামসুল হক লুৎফুর রহমানের কথা শুনতো পাক আর্মির বেশ বড় বড় কর্তারাও। তাদের আদেশ নির্দেশও মেনে চলতো। সাধারণ সিপাহীরা তো কর্নেল ব্রিগেডিয়ারের ন্যায় সম্মান করতো। স্যালুট দিতো।

শেরপুরের জামায়াত নেতা মদরিছ আলী (কালা মৌলভী) ছিলেন প্রধান দালালদের অন্যতম। তিনিও বাস করতেন সে অফিসে—ঐ সময়টাতে। দালালদের মধ্যে আরো নাম উচ্চারণ করেন মৌলভী ফজলুর রহমান, আব্দুল মান্নান চৌধুরী (ধোপাদীঘির পাড়), নূরুজ্জামান (কোম্পানীগঞ্জ), আব্দুল মজিদ, সালেহ আহমদ, সৈয়দ মশাহিদ আলী মশাদের। তিনি বলেন উল্লেখিতরা প্রায়ই আসতেন অফিসে। সভা করতেন নিজেদের মধ্যে। কখনো কখনো পাকিস্তানি অফিসারদের উপস্থিতিতে।

সৈয়দ আশরাফ হোসেন বলেন, 'সৈয়দ মশাহিদ আলীই তারা মিয়ার বাড়ি দখল করেছিল। জামায়াতের যুব এবং ছাত্র অংশ সে সময় ছিল সশস্ত্র অবস্থায়। রূপান্তরিত হয়েছিল আল-বদর বাহিনীতে। আর, কমান্ডার ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী।'

তিনি বলেন, বদর বাহিনীর অন্যান্য কমান্ডারদের মধ্যে ছিল আবু সায়ীদ ও আব্দুর রাজ্জাক। এদের দাপট তখন আকাশচুম্বি। এক এক জনকে মনে হয়েছে যেন এক একজন জেনারেল। ভয়ে ভয়ে থাকতেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সৈয়দ আশরাফ বলেন, সে সময় ওদের কোনো কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা বা কটাক্ষ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করেননি বরং আগ বাড়ি ছোট-বড় সবাইকে সালাম জানিয়ে সদ্ভাবের পরিচয় দিতেন। অন্যথায় যে কোনো মুহূর্তে নেমে আসতে পারতো মৃত্যুর পরোয়ানা।

পূর্ব পাকিস্তানে ভারী অস্ত্র দেবার দাবি

আওয়ামী লীগ নেতা শাহ আজিজুর রহমান (সাংসদ)। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। তার কাছে জানতে চাই আল-বদরের কার্যক্রম এর কমান্ডারদের নাম। বললেন, ওদের কর্মকাণ্ড এবং তালিকা স্বাধীনতার পর উদ্ধার করা হয়েছিল। সেটি আওয়ামী লীগ

নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজীর (সাংসদ, আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রী, মরহুম) কাছে ছিল। সুতরাং তিনিই ভালো বলতে পারবেন। কিন্তু তিনি নিজে কতটুকু জানেন?

শাহ আজিজ জানান, তার একজন ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন ছাত্রসংঘ নেতা শাহ জামাল। একাত্তরে যথারীতি তিনিও ছিলেন আল-বদর। খুবই ক্ষমতাশালী। পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডার জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী এবং জেনারেল রাও ফরমান আলীর সভায়ও বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি সে সভায় পূর্ব পাকিস্তানে আরো অধিক ভারী অস্ত্র সরবরাহ করার দাবি জানান। আল-বদর বাহিনীর হাতেও পাক বাহিনী অনুরূপ ভারী অস্ত্র দেবার দাবিও জানিয়েছিলেন। গভীরভাবে যুক্ত আল-বদর বাহিনীর সঙ্গে। তাকে রাজি করাতে পারলে এ বাহিনী সম্পর্কে ভালো তথ্য পাওয়া যাবে। তাছাড়া সাপ্পান চৌধুরী মাসে ২৫ হাজার টাকা করে রাজাকার আল-বদর ফান্ডে চাঁদা দিতেন। ইচ্ছে করলে তিনিও অনেক তথ্য দিতে পারেন। তার মতে আরো জানার জন্যে যোগাযোগ করতে হবে ফটোগ্রাফার আবুল লেইছ শ্যামল জগন্নাথপুরের সিরাজুল ইসলাম ও ইব্রাহীম আলী খানের সঙ্গে।

আওয়ামী লীগের অপর এক নেতা আশফাক আহমদ (সদর উপজেলা চেয়ারম্যান) জানালেন পাকিস্তানি সেনা বাহিনী এবং তাদের পদলেহী দালাল রাজাকার আল বদরের নির্মম নির্যাতন সহ্য করেও যারা বেঁচে আছেন তারা আরো ভালো বলতে পারবেন। কিছু নামও বলে দেন তিনি। তারা হলেন মাহারোজ বক্স মারুফ, হাজী আব্দুস সালাম, আব্দুস শাহীদ বুডু (মুতাওল্লি) এবং মক বক্স। কয়েকজন আল-বদর সদস্যেরও নাম দেন তিনি। বলেন এদের যে কেউ ইচ্ছে করলে দিতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তার দেয়া আলবদর সদস্যদের নামগুলো হলো আতিক রাহী, ফটিক ফয়েজ ও ওসমান আলী। যদিও ওদের কাউকেই পাওয়া যায়নি কিংবা সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়নি।

দালালের ঘরে ডেভিড : অন্ধকারে আমি

২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে আসেন ডেভিড বার্গম্যান। ভোর রাতে এসে ওঠেন আমার বাসায়। চা-পর্ব সমাপন করেই বসি আমরা আলোচনায়। এতদিনকার কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে করে আগামী করণীয় ঠিক করতে থাকি। সকাল ১০ টায় আসেন মেহেদী হাসান। যুক্ত হলেন তিনিও। ফিল্মিং করার প্ল্যান-প্রোগ্রামও তৈরি করতে থাকি আমরা। ফলে, এ কাজেই চলে যায় পুরো দিন। আলোচনার মাঝখানে দু'বার ডেভিড উঠে গিয়ে ফোন করেন—গীতা সায়হালকে। তিনি অবস্থান করছেন ঢাকায়। প্রতি প্রোগ্রামের ব্যাপারে অনুমোদন নিতে হয় তার।

সন্ধ্যায় বেরিয়ে যাই দু'জন শিবগঞ্জে। এডভোকেট সৈয়দ আশরাফ হোসেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি আবার। তারপর প্রয়োজনীয় অনুবাদকের খোঁজে বের হই

সেখান থেকেই। ঠিক করলাম সুকান্ত ভট্টাচার্য মনি, বেলাল আহমদ এবং দীপংকর মোহান্তকে।

রাত তখন ১১টা। ডেভিডকে পৌঁছাই এক দালালের বাড়িতে। একটি মৌলবাদি দলের জেলা এবং কেন্দ্রীয় নেতা। পেশায় আইনজীবী। জেলা শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। সাক্ষাৎকার দিতেও রাজি হয়েছেন। তবে, এ কাজে সহায়তা করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান খান মাহতাব (জঙ্গী মাহতাব মরহুম)। যাই হোক ঐ মৌলবাদি নেতার শর্ত ছিল সাক্ষাৎকার দেবেন ডেভিড বার্গম্যানকে। আমাকে সাথে নেয়া যাবে না। অন্য কোনো বাঙালিও না। আর কোনো বাঙালি তা জানতেও পারবে না। কিন্তু ডেভিডকে তো একা সেখানে যেতে দিতে পারি না আমি। সেটা সমীচীনও হবে না। তাই, নিয়ে যাই তাকে। এর আগে আরো এক রাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে রাত বোধ করি আড়াইটা পর্যন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তিনি। আর আমি ছিলাম বাড়ির বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে। দীর্ঘ সময় মশার উপদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। হাতে পায়ের নানা স্থান মশার কামড়ে ফুলে গিয়েছিল আমার। কাছেই কিছু লোককে বলেছিলাম—সে রাতে কোনো প্রয়োজনে ডাকাডাকি করলে যেন তাৎক্ষণিক সাড়া দেন।

সিলেটে জামায়াতে ইসলামি এবং ইসলামি ছাত্র সংঘের নেতা কারা ছিল, কে কে আল-বদর বাহিনীর কমান্ডার ছিল এবং হত্যা ধর্ষণ প্রভৃতি কাজের পরিকল্পনা কারা করতো সবই তার জানা এবং বলেও গেছেন তা অকপটে। আল-বদর বাহিনীর অফিসিয়াল কমান্ডার হিসেবে ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীর নাম উচ্চারণ করেন। তবে, পরিকল্পনা প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন আবু সায়ীদ। তা ছাড়াও শান্তি কমিটির তালিকা দিয়েছে নিজের নাম উহ্য রেখে। বলেছেন আল-বদর বাহিনীর কমান্ডার এবং সদস্যদের নাম। ওদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব স্থানে হত্যাকাণ্ড এবং নারী নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে তাও বর্ণনা করেন।

পরে ক্যামেরার সামনেও কথা বলেছেন তিনি। তবে সেদিনও আমি থাকতে পারিনি। আমাকে নেবার অনুমতি ছিল না। ডেভিড এবং ক্যামেরাম্যান শুধুই বিদেশিরা। স্বদেশি কেউ নয় সেখানে। কিন্তু আমি ছিলাম ঐ বাড়ির বাইরে—যথারীতি নিজেকে আড়াল করে করে। কাছেই এক ম্যাচে বসিয়ে রেখেছিলাম কয়েকজন বন্ধুকে। যাক, ডেভিডরা ঠিকই সমাপন করেন কাজ। পাওয়া যায় প্রচুর উপাত্ত।

'দ্যা ওয়্যারক্রাইমস্ ফাইল' প্রমাণ্য চিত্রটি যারা দেখেছেন—তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে—মুখের সামনে পর্দা টেনে দিয়ে ক্যামেরায় সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন এক শ্মশ্রুমণ্ডিত ভদ্রলোক। মাথায় টুপি পরা সেই মৌলবাদি নেতার কখনো পেছন থেকে, কখনো পর্দার আড়াল থেকে পোজ নেয়া হয়েছে। তার দেয়া তথ্য উপাত্তগুলো সহায়ক হয়েছে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে।

আজ এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে মনে পড়ে সে রাতগুলোর কথা। যখন তার

সাক্ষাৎকার নিতে ডেভিড ছিলেন তারই বাড়িতে। আর, মশার কামড় সহ্য করে করে বাইরে সময় কাটিয়েছি আমি। শুধু মশা নয়-মানুষ নামক জীবের ভয় ছিল আরো অধিক।

ইন্টারপ্রিটার সমস্যা

২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ফিল্মিং। কিন্তু তখনো অনেক কিছু যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন। সে কাজগুলো করতে গিয়ে গলদঘর্ম আমি। ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতেরও অনেক পরে যাই বিছানায়। কিন্তু ২১ মার্চ খুব ভোরে ত্যাগ করি শয্যা। ৮ টার আগেই ত্যাগ করি আমরা হোটেল পলাশ সেখান থেকে গেলাম হিল টাউনে। সেখানে সবার জন্যে রুম ভাড়া করে রওয়ানা করি বিয়ানীবাজার। ডেভিডসহ ইন্টারভিউ করি শিক্ষক ফয়জুল আলম, মাওলানা ছমির উদ্দিন, মছদ্দর আলী মষত্তি ও রফিক উদ্দিন তোতা মিয়ার।

ফেরার পথে রামধার আগেই একটি স্থানে পেলাম মেহেদীকে। তিনি কানাইঘাটে ছিলেন। সেখান থেকে আনিসুল আলমকে নিয়ে এসেছেন। রাস্তায় বসে বসে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে। সেখানেই মিটিং ওদের সঙ্গে। আনিসুল আলামকে সর্বশেষ কাজের নির্দেশনা দিয়ে ফিরে আসি আমরা শহরে।

পরের দিন আমাদের বাহন দরকার আরো। সে অনুযায়ী গাড়ি ঠিক করি আমরা মুক্তিযোদ্ধা সেলিম আহমদের সাহায্যে। কিন্তু ইন্টারপ্রিটার সেলিম আহমদই সন্ধান দিলেন আতাউর রহমান খানের। বাড়ি তার গোলাপগঞ্জ থানায়। স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই বাস করছেন ব্রিটেনে। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগেরও সভাপতি। দেশে এসেছেন বেড়াতে। বাস করেন-সিলেট শহরেই। রাত সাড়ে ১০ টায় কথা বলি উনার সঙ্গে। রাজি হলেন আমাদের সাথে গিয়ে ইন্টারপ্রিটিং করতে।

এর আগেই ঢাকা থেকে এসেছে একটি টিম। বিভিন্ন ঘটনার পুননির্মাণ দেখাতে ওদের ব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে সকাল ১০ টায় এসে পৌছান গীতা, হাওয়ার্ড ও টিম। অল্প সময়েই পর্যালোচনা করা হলো প্ল্যান প্রোগ্রাম। এরপর রওয়ানা করি কানাইঘাটের উদ্দেশ্যে। প্রথম থেকেই আতাউর রহমান খানকে নিয়ে মজা করছিলেন সবাই। কিন্তু খুব কম সময়ে গাড়ির সবাই বিরক্ত হয়ে পড়েন।

কানাইঘাটের পথে মালীগ্রামে প্রথম ভিডিও ধারণ করা হবে। ডেভিড সাক্ষাৎকারদাতাকে প্রশ্ন করবেন। আর, সে প্রশ্ন বাংলা করে বুঝিয়ে দেবেন ইন্টারপ্রিটার আতাউর রহমান খান। আবার, ঐ লোকের উত্তরটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলতে হয় ডেভিডকে। শুরু হলো সাক্ষাৎকার গ্রহণ। আমি তখন সার্বিক বিষয়গুলো দেখছিলাম। কিন্তু খান সাহেবের কাজে ডেভিড সন্তুষ্ট নন। ডাকলেন আমাকে। বললেন খান যে ভাবে যা করছেন তা দিয়ে হবে না। সুতরাং আমাকেই করতে হবে সে কাজ।

এতদিন পর্যন্ত আমরা প্রচুর মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাদের ৯০ ভাগই ইংরেজি জানে না। সে সময় আমিই দোভাষীর কাজ করতাম ডেভিডের সঙ্গে। কিন্তু এখন তো দ্রুত কাজ করতে হবে। চারদিকে আমার প্রচুর কাজ। তারপরও এটি করতে হলো আমাকে। অন্যান্য দিক সামাল দিয়ে দিয়েও এ কাজটা করতে হয়েছে শেষ অবধি।

কানাইঘাটে আতাউর রহমান খানকে বলা হলো—এখানে আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মী আছেন তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করাতে। যাবার সময় নিয়ে যাওয়া হবে তাকে। তাই করলেন তিনি। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তা জানি না আমরা। প্রচুর মাছ কিনে নিয়েছেন তিনি। যারা তাকে লক্ষ্য করছিলেন তারা জানান মাছ বিক্রেতাকে তিনি জানান—লন্ডন থেকে গেছেন দেশে। সিনেমা নির্মাণ করছেন। অতএব তাকে বিনা মূল্যে কিংবা স্বল্প মূল্যে মাছ দেয়া উচিত। বিক্রেতা তখন দাম হাকাতে থাকে অধিক। প্রচুর মূল্য দিয়ে কিনে সে মাছ। আর ফেরার পথে দিলেন এর বর্ণনা। বললেন, বাজারের লোকজন তার পরিচয় জানার পর নিজেরা কিনে দিয়েছে মাছ। শহরে ফেরার পরও একই কথা বলে বলে বিলিয়েছেন তা বাসায় বাসায়।

দো-ভাষীর কাজ করতে ব্যর্থ হলেও আতাউর রহমান খান সবার হাসির খোরাক হয়েছিলেন। আনন্দও দিয়েছেন এভাবে।

সে রাতে কানাইঘাটে

সেদিন ছিল ২২ ফেব্রুয়ারি। বাংলা ১০ ফাল্গুন এবং হিজরি ১৪১৫ সনের ২১ রমজান। বিকেলে পৌঁছলাম কানাইঘাট বাজার। থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডা. ফয়জুল হক। বাজারেই তার চেম্বার। সামনে ফার্মেসি। সেখানে আমরা ভিডিও করবো সাক্ষাৎকারদাতাদের। স্থান হিসেবে নির্বাচন করি ডাক্তারের চেম্বারকেই। চলছে আমাদের প্রস্তুতি কর্ম। এসেছেন সাক্ষাৎকারদাতারাও। এর মধ্যে বাজারে লক্ষনীয় হয়ে উঠে জামায়াত-শিবিরের আনা-গোনা। আমাদের কাছেও আনতে থাকে নানা ধরনের সংবাদ। আনা হলো কানাইঘাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নূরুল আম্বিয়া চৌধুরী এবং থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জমির উদ্দিন প্রধানকে। ফার্মেসির বাইরে দু'টি চেয়ারে বসে আছেন তারা। চেম্বারে চলছে প্রস্তুতি কাজ। তদারক করছেন হাওয়ার্ড। গীতা, ডেভিড, টিম, রঞ্জন সবাই ব্যস্ত সেখানে।

কে একজন এসে জানতে চাইলো ফার্মেসিতে কি হচ্ছে? এখানে বিদেশি লোকেরা কেন এসেছেন, কি কাজ করছেন তারা? কিছুক্ষণ পর আবার আসে দু'জন পুলিশ। বললো, এখানে বাইরের লোক যারা এসেছেন তাদেরকে সালাম জানিয়েছেন ইউ.এন.ও সাহেব। কিন্তু কেন? পুলিশের জবাব—ইউ.এন.ও সাহেব জানতে চান কি হচ্ছে এখানে। জমির উদ্দিন প্রধানের জবাব-'এখানে থানা আওয়ামী লীগের ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু বিদেশি লোকেরা কেন? আবার প্রশ্ন পুলিশের। জমির

উদ্দিন প্রধান 'বললেন—ওরা আমাদের অতিথি।' পুলিশ জানায়—ইউ.এন.ও সাহেব সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ততক্ষণে বেরিয়ে আসেন ডা. ফয়জুল হক। বললেন, 'এটি আমার ঘর। আমার ফার্মেসি, আমার চেম্বার—ইউ.এন.ও বা ও.সি. সাহেবদের নয়। আমি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি। উনি সেক্রেটারি (জমির উদ্দিন প্রধানকে দেখিয়ে)। আমরা ইফতার পার্টির আয়োজন করেছি। আমন্ত্রণ কোনো দেশের কাকে করলাম না করলাম সে জবাব ইউ.এন.ও. সাহেবকে দেয়ার কথা নয়। আওয়ামী লীগের সভার ব্যাপারে ইউ.এন.ও বা ও.সি. সাহেবকে জবাবদিহী করতে হবে কেন? উনারা তো আওয়ামী লীগের নেতা নন। দলের নেতা শেখ হাসিনা। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের জন্যে শুধু উনার কাছেই জবাবদিহি করি। ইউ.এন.ও সাহেব এর বেশি কিছু জানতে চাইলে এখানে আসতে বলবেন। এখন আপনারা আসুন। আস্‌সালামু আলাইকুম। চলে গেল পুলিশেরা। বাজারের অবস্থাও মনে হলো—কেমন যেন থম থমে।

ইফতারের সময়। ডা. ফয়জুল হক আয়োজন করেছেন ইফতারির। তার চেম্বারেই আমরা খেলাম। বাজারে তখন জামায়াত নেতা কর্মীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। কেউ কেউ বললেন ইফতারে পরে জামায়াত শিবির মিছিল বের করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাতে আমাদের কি? ওরা মিছিল করবে না কি করবে—তাতে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। এরকমই একটা ভাব প্রকাশ করছিলাম। কিন্তু আমাদের কাজটি খুব দ্রুত সমাপ্ত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। শুরু করলাম এবারে সাক্ষাৎকার নেয়া।

ভেতরে আমাদের কাজ করছি আমরা। বারান্দায় যথারীতি বসে আছেন নূরুল আম্বিয়া চৌধুরী এবং জমির উদ্দিন প্রধান। বাইরে এখানে ওখানে জামায়াতিদের জটলা। এবারে পেলাম আর একটি সংবাদ। তারাবির নামাজ শেষে জামায়াত শিবির মিছিল বের করবে এবং ফার্মেসিতে এসে জানতে চাইবে—কি হচ্ছে এখানে। আগে থেকে আমাদের একটা টার্গেট ছিল—রাত ৯টার মধ্যে কাজ শেষ করা হলোও তাই। এর মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেছে নামাজ। মুসল্লিরা চলে গেছে যার যার পথে। শুধু জামায়াতের কিছু লোকজন দেখলাম এখানে-ওখানে জটলা করতে। শেষ এক দফা চা পানে আপ্যায়িত করলে আমাদের জ্যেষ্ঠ এবং রিসোর্স পারসন ডা. ফয়জুল হক। তারপর আবার রওয়ানা করি সিলেট শহরের দিকে।

হোটেলে অবস্থান করে করে দীর্ঘ সময় ধরে ঠিক করলাম পরবর্তী প্রোগ্রাম।

একজনের জন্যেই

২৩ ফেব্রুয়ারি। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল চারখাইয়ে। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে তা পরিবর্তন করা হলো। প্রথমত: আতাউর রহমান খান ছিলেন অপ্রয়োজনীয়। যে উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছিল সে কাজে মোটেই সফল নন যে কারণে একেবারেই কাজে

লাগানো যায়নি তাকে। অন্যদিকে সবাই তাকে নিয়ে মশকরা করলেও প্রত্যেকের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তার দ্বারা। সুতরাং তার উপস্থিতি কারোর-ই কাম্য নয়। কিন্তু তিনি যেতে চান আমাদের সঙ্গে। গতকাল তাকে জানানো হলো—আজ আমরা কোথাও যাবো এবং তাকেও আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেতে চান তিনি সাথে। শুধু সঙ্গ দেবার তরে। নানাভাবে চেষ্টা করেও তাকে বুঝানো সম্ভব হয়নি যে, তার উপস্থিতিটা অপ্রয়োজনীয় এবং বিরক্তিকরও। তাছাড়া গোপনীয়তা রক্ষা করার স্বার্থেও ও পদক্ষেপ নেয়া জরুরি ছিল।

সকালে শুরু হয় ঝড় ও বৃষ্টি। দীর্ঘ সময় ধরে ঝরছিল বৃষ্টি। এর মধ্যেও আতাউর রহমান খান এসে হাজির হন। বলা হয় আজ আমরা কেউ কোনো কাজ করছি না। ছুটি ভোগ করবো। এ সময় বলে উঠে তিনি থাকবেন আমাদেরই সঙ্গে। এবারে একটু বিরক্তি প্রকাশ করে ডেভিড বলে সবাই তো এক সাথে থাকছে না। তাছাড়া প্রত্যেকেই আলাদা তার নিজ নিজ ব্যক্তিগত কাজ কর্ম করবে। তিনি তাকে চলে যেতে বলে জানিয়ে দিলেন—আমাদের প্রয়োজন হলে তাকে ডেকে পাঠাবো। অন্যথায় যেন না আসেন।

শুধু তাকে পরিহার করার জন্যে প্রোগ্রামটাই পরিবর্তন করা হলো। তা হলে আমাদের একদিন নষ্ট হবে? না, প্রোগ্রাম তো বাতিল হয়নি। শুধু পরিবর্তন করা হয়েছে। চারখাইয়ের পরিবর্তে কাজ করবো আমরা সিলেট শহরে। খান সাহেবকে বিদায় করার পর পরই বেরিয়ে পড়ি আমরা চিত্র ধারণ করি আলিয়া মাদ্রাসার, ডা. শামসুদ্দিন আহমদ ছাত্রাবাস এবং আবহাওয়া অফিসের গণ কবর ইত্যাদি স্পটের।

ইফতারের আগে পর্যন্ত কাজ করলাম আমরা। সময়টাকে কাজে লাগাই এভাবেই। কিন্তু পুরো দিনটাই সবার মুখে মুখে ছিল আতাউর রহমান খানের বিভিন্ন ডায়লগ।

নৈশভোজে গীতা -ডেভিডের শর্ত

বাইরে না গিয়ে কাজ করছি শহরে। তাই আমাদের সময়েরও সাশ্রয় হচ্ছে। ইফতার শেষে রওয়ানা হই কুশিয়ারা রেস্ট হাউসের উদ্দেশ্যে। সেখানে আছেন একাত্তর সালে সিলেট জেলা ছাত্রলীগ নেতা সদর উদ্দিন চৌধুরী (জাসদ জেলা সভাপতি, পরে বি.এন.পি)। তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু তিনি ঐ দিন কোনো সাক্ষাৎকার দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বরং শনিবারে ইফতারের দাওয়াত করেন আমাকে বলেন সেদিনই সাক্ষাৎকার দেবেন তিনি।

অন্যদিকে হোটেল হিল টাউনে কম্ফর্ট ফিল করেননি গীতা-হাওয়ার্ড। সুতরাং তাদের জন্যেও রুম বুক করি পলাশে। সবাইকে তুলি এবার একই হোটেলে। এরপর কি? পরের দিনের সমস্ত কর্মসূচি মোটামোটি প্রস্তুত। আজ সম্পাদন করার মতো তেমন কোনো কাজ নেই হাতে। কে জানি এমন প্রস্তাবটা উত্থাপন করলেন। রাতে

সবাই এক সাথে ডিনার করি। 'হোটেল পলাশ'-উত্তর দিলেন প্রস্তাবকারী। কিন্তু গীতার প্রশ্ন শেষ হয়নি। জানতে চাইলেন খাবার বিল পরিশোধ করবে। সবাই কি যার যার বিল মিটাবে—না একজন তা পরিশোধ করবে? উত্তর আসলো-'না, একজনই তা পরিশোধ করতে হবে আর, তা করবে গীতা সায়হাল।'

স্মিত হাসির রেখা তার মুখে। বললেন, ডিনার পার্টি হতে পারে তবে, আমাদের টিমের বাইরে থেকে একজন গেস্ট আনতে হবে। এ শর্ত পালন করলে তিনি বিল পরিশোধ করতে সম্মত আছেন হেসে উঠেন কেউ কেউ। হয়তো কারো কারো ধারণা হয়েছিল গীতা আতাউর রহমান খানের কথাই বলছেন জোক করার জন্যে। কিন্তু গীতা সিরিয়াস। সেটা বুঝা যাচ্ছিল তার মুখায়ব থেকেই। এ সময় ডেভিড বললেন—'না একজন নয়। গেস্ট আনতে হবে দু'জন।' গীতা রাজি তাতে। তা হলে কেউ একজন যেতে হবে অতিথিদের নিয়ে আসতে। তবে, আমাকে যেতে নিষেধ করলেন গীতা। তখনই মেহেদী বলেছিলেন, 'এতক্ষণে পরিষ্কার হয়েছে আমার কাছে। আমি যাচ্ছি অতিথিদের নিয়ে আসতে।' সাথে সাথে বেরিয়ে যান, ৯'টার মধ্যে এসে হাজির হয় আমার স্ত্রী হাজেরা এবং শ্যালিকা আমেনা। পূরণ হলো গীতার শর্ত। দিলেন তিনি ডিনার পার্টি। হৈ হল্লা করে কাটাই আমরা রাত ১১টা পর্যন্ত।

দু'টি সেতু ও বিজলিবাতি

ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছি মাত্র। ডাক পড়ে সেহেরি খাবার। এর পরই বসে পড়ি ডায়েরি নিয়ে। লিখে রাখি গত দু'দিনের কার্যক্রম। তার পর গোসল করে প্রস্তুত হয়ে নেই বাইরে যাবার তরে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া করা গাড়ি আসেনি। তাৎক্ষণিক, আম্বরখানা থেকে ভাড়া করি অন্য একটি গাড়ি। দু'টি গাড়ি নিয়েই হওয়া করি সিলেট জকিগঞ্জ সড়ক ধরে। বানীগ্রামের রাস্তায়ই সাক্ষাৎকার নেই গিয়াস উদ্দিনের। এর আগের দিন শহরে আমরা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি শাব্বীর জালালাবাদী এবং সাইদুর রহমান খান মাহতাবের।

সড়কের বাজার থেকে বামদিকে একটি রাস্তা সোজা গিয়ে উঠেছে বি.এন.পি. নেতা হারিছ চৌধুরীর বাড়ির সামনে দিয়ে সুরমা তীরে। সে রাস্তাটি যেখান থেকে শুরু সেখানেই একটি মসজিদ। এর সাথে আমরা রাস্তা এবং মসজিদের চিত্র ধারণ করছিলাম। জমে গেছে প্রচুর লোকজনও। এর মধ্যেই বেরিয়ে আসেন মসজিদের ইমাম। জিজ্ঞেস করেন কি করছি। এটা ওটা বলে যেন সময় অতিবাহিত করছিলাম আমরা। কিন্তু ইমাম সাহেব খুব গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন আমাদের কর্মকাণ্ড। কিছুক্ষণ পর আবার প্রশ্ন করেন—এসব কি করছি কেন করছি? এবারেও একই উত্তর আমাদের। অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষেপে যান ইমাম। বললেন, 'আপনারা তো একাত্তর সালের কি করছেন।' এর বেশি কিছুই বলতে পারেন না। বার বার একই কথা তার- 'আপনারা তো একাত্তরে কি করছেন।' এ কথাটা বার বার বলছেন এবং ক্ষোভে ফুঁসে

উঠছেন। মনে হলো খুব বড় ধরনের বিপদে পড়তে পারি আমরা। ইমাম সাহেবের কথা গ্রামের মানুষ সহজেই বিশ্বাস করবে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে তারা আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। তা হলে কি করবো আমরা? কাজ বন্ধ করে কি পালিয়ে যাবো? এতদিনের পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? ইমাম সাহেবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সময় অতিবাহিত করা হচ্ছে। আর পাশাপাশি চলছে আমাদের কাজ।

এক সময় ইমাম সাহেব চিৎকার করে করে একই কথা বলতে থাকে এর মধ্যেই ঘটে যায় অবাক করা একটি ঘটনা। ভিড়ের মধ্য থেকেই কে একজন তার চেয়েও অধিক উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলে উঠেন, 'চুপ করেন ইমাম সাহেব। একাত্তর নিয়ে আর একটি কথাও বলবেন না। সবার দৃষ্টি চলে যায় ওর দিকে। ইমাম সাহেবের দৃষ্টিও সে দিকে।

কিন্তু লোকটিকে কেউ-ই দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, তিনি একটু বেঁটে। ভিড় ঠেলে চলে আসলেন সামনে। একেবারে ইমাম সাহেবের মুখোমুখি। তখনই দেখি আমাদের টিমের এক সদস্য আহমদ হোসেন। নাটকের লোক। নাটকীয় ভঙ্গিতেই কথা বলছেন। গলার সমস্ত জোর উদগীরণ করে করে তর্জনী উঠিয়ে চোখ লাল করে বলে চলেছেন 'ইমাম সাহেব, '১৯৭১ নিয়ে আর একটি কথাও বলবেন না। আপনি জানেন না—এই একাত্তর আমাদের সোনার পাকিস্তান ভেঙ্গেছে। ইসলামি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের গোলাম করেছে। আজ আমরা হিন্দুদের তাবেদার হয়ে আছি। আমাদের আলেম-ওলামাদের কোনো মূল্য নেই। মাওলানা আবু সায়ীদের মতো বিশ্বনন্দিত লোকদেরও দেশে কোনো কদর নেই। এসবই হচ্ছে—একাত্তরের কারণে। তারপরও আপনি বার বার একাত্তর একাত্তর বলছেন? এ শব্দটি শুনলে গায়ে আগুন ধরে। আর কখনো তা উচ্চারণ করবেন না।'

একটু থামলেন—আহমদ হোসেন। ক্লান্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই। আমরা সবাই তো তার অভিনয়ে অবাক। তাকিয়ে আছি মুখের পানে। আশ্চর্য ব্যাপার। অভিভূত হয়ে গেছেন ইমাম সাহেব। মুখে তার অমায়িক স্বর। সোহাগ-মাখা কণ্ঠে এবারে প্রশ্ন করেন, 'তা হলে সত্যি করে বলেন বাবারা কি করছেন আপনারা? আর ঐ বিদেশি লোকগুলো কারা? আহমদ হোসেন পাল্টা প্রশ্ন করেন—'আপনার বাড়ি কি সিলেটে নয়?' ইমাম সাহেব উত্তরে জানালেন—তিনি এ অঞ্চলেরই লোক। 'হায় আফসোস' বলে মাথায় হাত দিলেন আহমদ। বল্লেন, 'সারা বিশ্বের মানুষ যাদের চিনে, এ অঞ্চলের লোক হয়েও আপনারা চিনতে পারলেন না তাদেরকে। এ দুঃখ রাখবো কোথায়?' ইমাম সাহেব তো কিছুই বুঝতে পারছেন না। এমন কি আমরাও অনুমান করতে পারিনি—কি বলতে যাচ্ছেন তিনি। অন্যদিকে ইমাম সাহেব এবং এলাকার লোকজন, যারা ছিলেন তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দারুণ উৎসুক্য। প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টি আহমদের দিকে। শুরু করলেন তিনি আবার। এ এলাকায় জন্ম নিয়েছেন দু'জন বিশিষ্ট লোক। তাদের একজন হলেন—প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা—

হারিছ চৌধুরী। আসলে হারিছ চৌধুরীই চালান সরকার। তার কোনো কথাই ফেলতে পারেন না খালেদা জিয়া। অন্যদিকে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন মাওলানা আবু সায়ীদ। আর, বলতে পারলেন না, ইমাম সাহেব বললেন এই তো এই বার্তাটিই হারিছ চৌধুরীর। আমাদের লোক। আর এই ... যে বাড়িটি দেখছেন একটু পশ্চিমে তাকান—সেটিই হচ্ছে মাওলানা আবু সায়ীদের বাড়ি। তিনি এখন লন্ডনে।

আহমদ হোসেন তো গল্প শেষ করতে হবে। না, হলে বিপর্যয়ে পড়তে পারি আবার। তাই, ওদের আর কথা বলতে না দিয়ে আবার গলা চড়িয়ে ফ্লোর নিয়ে গেলেন। বললেন, 'হারিছ চৌধুরী এবং আবু সায়ীদ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে সমস্ত কানাইঘাটবাসীর পক্ষ থেকে দু'টি দাবি উত্থাপন করেছেন। এর একটি হলো-'এক মাসের মধ্যে পুরো কানাইঘাট উপজেলার প্রতিটি ঘরে সুরমা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সরকারের এত টাকা তো নেই সে অল্প সময়ে এত বড় বড় কাজ করবে। অথচ এরা দু'জনকে নাও বলতে পারেন না। তাই ব্রিটিশ সরকারের কাছে ঋণ চেয়েছে সরকার। আর, ব্রিটিশ সরকার জানতে চায় কত টাকা খরচ হবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কতদিন সময় লাগবে। পাঠিয়েছেন হাই পাওয়ার ডেলিগেশন। তাদের সাথে আমাদের সবাইকে যুক্ত করে পাঠিয়েছেন আমাদের নেতা হারিছ চৌধুরী।

'আলহামদুল্লিাহ' সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ইমাম সাহেব, বললেন, 'ইয়া আল্লাহ্ তুমি আমাদের ঘরে ঘরে বাতি জ্বালাও।'

আমরা চলে গেলাম গ্রামে। একেবারে আবু সায়ীদের বাড়িতে। সেখানে তার ঘর জন্মস্থান ইত্যাদি প্রতিটি স্থানের চিত্র ধারণ করে যখন ফিরছি তখন এলাকাবাসীর মধ্যে শুরু হয়েছে তর্ক যুদ্ধ। এক পক্ষ বলছে এদিকে হবে সেতু—অন্য পক্ষের দাবি ওদিকে। আহমদ হোসেন এরও মিমাংসা দিয়ে আসলেন। আপনারা চাইলে দুটি সেতু করার পরামর্শ দিতে পারি আমরা। তাতে মহা-খুশি সবাই। আর, এর রেশ কাটার আগেই সে অঞ্চলের কাজ সমাপ্ত করে চলে আসি আমরা।

জামায়াতের ভয়ে

২৪ ফেব্রুয়ারি সড়কের বাজার থেকে ফিরি চারখাই। পীর ইয়াজ মিয়া তাপাদারের বাড়িতে সাক্ষাৎকার নেই—আকলাছ আলী, শফিক উদ্দিন কাজল ও জমির উদ্দিন তাপাদারের। চিত্র ধারণ করি ঐ বাড়ি, পুকুর এবং জলসা পীর তারণ, চারখাই স্কুল, গদারবাজার ফেরিঘাট ইত্যাদি। ২৫ ফেব্রুয়ারি শহরে টুকটাক কাজ করি গীতাকে সাথে নিয়ে। তারপর সবাইকে নিয়ে এক সাথে চলে যাই কানাইঘাটের গাছবাড়িবাজার। আর ওখান থেকে চারখাই পর্যন্ত ফিরি একসাথে। এবারে বিভক্ত হলাম আমরা দু'ভাগে। ছোট গাড়িটি নিয়ে আমি একা চলে যাই বিয়ানীবাজার। আর বাকি টিম থাকলো চারখাই। বিয়ানীবাজারে চিত্র ধারণের পুরো প্রস্তুতি সম্পন্ন করবো আমি। ওরা চারখাইয়ের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করে আসবে বিয়ানীবাজার।

বিয়ানীবাজার উপজেলা সদরে প্রবেশ করার আগেই শহীদ টিলা। তারপর ডাক বাংলো। সেখানে বাস করতো নারী লোলুপ ইফতেখার হোসেন গণ্ডল। এর পশ্চিমের টিলাতেই উপজেলা কমপ্লেক্স। মধ্যখানে কাঁঠাল তলা। বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছিল পাকহানাদার বাহিনী। স্বাধীনতার পর জেনারেল ওসমানীর উপস্থিতিতে সমস্ত কংকাল একত্র করে অদূরেই পুঁতে রাখা হয়েছিল। সে সব স্থানের চিত্র ধারণ করা হবে। তবে, এটুকু কাজ সমাপ্ত করেই ওরা সবাই পেছনে চলে আসবেন কিছুটা অবস্থান করবেন গাড়ির ভেতরেই। ততক্ষণে অন্যান্য কাজগুলো সমাপ্ত করবো আমি।

বাজারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমি। গাড়ির গতি খুবই স্লো। একটি ফার্মেসিতে বসে আছেন আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলাম নাহিদ। গাড়ি থামাতে বলি চালককে। গেলাম উনার কাছে। সামনে দাঁড়াতে জানতে চাইলেন—আমি একা কী না? না, আমরা সবাই আছি। একথা বলার সাথে সাথেই প্রশ্ন করলেন—ওরা কি বাজারে? বললাম, না, কেউ বাজারে প্রবেশ করবে না। আমরা সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। জানতে চান মাওলানা ছমির উদ্দিন আহমদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি কী না? তা হলে সে সাক্ষাৎকার কি টেপে ধারণ করেছি? আমি জানালাম আজ রাতেই ভিডিও করবো। তখনই আস্তে করে বললেন—আজ যদি উনি কথা না বলেন? তারপরই চলে গেলেন অন্য প্রসঙ্গে।

নূরুল ইসলাম নাহিদের শেষ কথাটি যেন অনেকগুলো প্রশ্নের জন্ম দেয়। নানা দিক দিয়ে ভাবতে ভাবতে গাড়ি ঘুরিয়ে গেলাম মতিন পেট্রোল পাম্পে। মালিক আব্দুল বাতিন মাস্টার। অনুরোধ করলাম সন্ধ্যার পর পরই আমার সঙ্গে নবাং যেতে। সবিনয়ে প্রত্যাখান করলেন আমার অনুরোধ। জানালেন, ইতোমধ্যে তিনি আমাকে যেটুকু সহায়তা করেছেন তাও হয়তো প্রকাশ হয়ে পড়েছে জামায়াতিদের কাছে। ওরা তাকে প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়েছে। তাই, আমার সাথে আর কোথাও যাবেন না। তাকে না জড়ানোরও অনুরোধ করেন বার বার। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফেলে কোথাও যেতে পারবেন না, তাদের পরিবার পরিজন রয়েছে এখানে। সবাইকে নিয়ে বিপদে পড়তে চান না তিনি।

বুঝলাম কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে। তা হলে আমদের চিত্রগ্রহণ প্রকাশ ব্যর্থ হয়ে যাবে? দ্রুত চলে যাই আব্দুল মালিক ফারুকের বাড়ি। তুলে নিয়ে আসি তাকে। আসতে আসতে জেনে নেই কিছু তথ্য। মাওলানা ছমির উদ্দিনের বাড়ির অপর অংশের বাসিন্দা মাহতাব উদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ। সংবাদ পাঠালাম তাদের কাছে। রাতে আমরা যাচ্ছি ঐ বাড়িতে। স্বাধীনতা বিরোধী মহল দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকা রয়েছে। তাই, প্রয়োজনে যেন সাহায্য করেন।

ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কোথায়, কোনো্ এক দোকানে ইফতার করি। ততক্ষণে বৃষ্টিও হয়ে গেছে এক পশলা। সন্ধ্যার পর পরই মনে হলো ঘুটঘুটে অন্ধকার। বেরিয়ে আসলাম বাজারের উত্তর দিকে। রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করে

অপেক্ষায় আছে আমাদের পুরো টিম। মিলিত হলাম তাদের সঙ্গে। ছোট্ট করে ডেভিডকে বললাম—মাওলানা ছমির উদ্দিন হয়তো আর কোনো কথা বলবেন না। কিন্তু কেমন করে বুঝলাম? পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে আমার তাই মনে হচ্ছে। তাছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষের লোকজন কোনো সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে—এসব হিসেবে রেখেই যেতে হবে। এক মিনিট পরামর্শ হলো হাওয়ার্ডের সঙ্গে তাৎক্ষণিক গৃহীত হলো সিদ্ধান্ত। আমাকে ডেকে নেয়া হলো ঐ গাড়িতে। তারপর বের করলাম ডায়েরি। দু'রাত ধরে মাওলানা ছমির উদ্দিনের যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম—তার মূল পয়েন্টগুলো অনুবাদ করে বলতে থাকি ডেভিডকে। আর, ডেভিড নিজেও ছিলেন এক রাত। তাই, তার নিজের পয়েন্টগুলোর সঙ্গে আমার পয়েন্টগুলো মিলিয়ে টাইপ করতে থাকেন ল্যাপটপে। রাস্তায় চলতে চলতেই করে নিচ্ছি এ কাজগুলো। প্রস্তুত হলো একটি রিপোর্ট। আমার একার কাছে দেয়া ছমির উদ্দিনের সাক্ষাৎকার তার সাথে ডেভিড ও আমাকে এক সঙ্গে দেয়া সাক্ষাৎকার মিলিয়ে টাইপ হলো দীর্ঘ রিপোর্ট। প্রিন্ট অডিটও বের করা হলো। উভয়ে দেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করা হলো রিপোর্টটি। ততক্ষণে অন্য টেকনিক্যাল দিকগুলো চূড়ান্ত করেছেন হাওয়ার্ড।

আমাদের দু'টি গাড়িই স্টার্টে থাকবে। অন থাকবে হেড লাইটও। গাড়ি ঘুরিয়ে আমাদের ফেরার পথেই রাখা হবে। আর, হাওয়ার্ড, ডেভিড এবং আমি যাব বাড়িতে। অন্যান্য সবাই থাকবে গাড়িতে। বসা ঘরের একটা বর্ণনাও জেনে নেন হাওয়ার্ড। তারপর বললেন, ভেতরে ঢুকেই একই সোফায় বসবো আমরা তিনজন। আমি মধ্যখানে—ওরা দু'জন দু'পাশে। সামনে টি-টেবিলের উপর থাকবে হাওয়ার্ডের হ্যান্ড ব্যাগটি। কোনো ভাবেই এটি সরানো যাবে না। মাওলানা সাহেব বসার ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই আমি তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করবো। সে বিষয়েও কিছু টেকনিক শিখিয়ে দেন হাওয়ার্ড। এ বাড়ির লোক ব্যতীত অন্য কেউ বিশেষ করে সন্দেহভাজন কারো আগমন লক্ষ্য রাখার জন্যেও দায়িত্ব দেয়া হয় একজনকে। হ্যাঁ, পৌঁছে গেলাম আমরা নির্দিষ্ট বাড়িতে। কার্যকর হলো বাইরের জন্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো। তারপর ভেতরে গেলাম আমরা তিনজন।

কাজের লোকই দরজা খুলে দেয়। জানালাম, মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। লোকটিও ভেতরে চলে যায়—তাকে ডেকে দিতে। এদিকে বসার ঘরের জন্যে আমাদের পরিকল্পনাও ততক্ষণে বাস্তবায়ন করা হলো। সোফায় আমরা বসার আগেই ঠিক ঐ সোফার সামনে একটি চেয়ার পেতে রাখি। উনার জন্যে। আসলেন তিনি। সালাম বিনিময় হলো তার সঙ্গে। কিন্তু আমাদের চেয়ারটি টেনে নিয়ে গেলেন অনেক পেছনে—একেবারে ওয়ালের সাথে। শুরু করলাম কথোপকথন। কিন্তু কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না তিনি। অনেকগুলো প্রশ্ন করলেও তিনি ছিলেন নিরব। পীড়াপীড়ি করলে বলেন, 'আমার যা বলার বলে দিয়েছি আগেই। নতুন আর কিছুই

নেই বলার।' মনে পড়ে গেল নূরুল ইসলাম নাহিদের কথা—'আজ যদি উনি কথা না বলেন?' আব্দুল বাতিন মাস্টার বলেছিলেন—সবাইকে নিয়ে বিপদে পড়তে চান না তিনি।

কেটে গেছে বেশ কিছু সময়। মাওলানা ছমির উদ্দিন কোনো কথাই বলতে চান না। এ বিষয়ে আগে যা বলেছেন-এর বাইরে আর কিছুই নয়। এবারে প্রশ্ন দু'রাত কয়েক ঘণ্টা করে আমি তার সাক্ষাৎকার নিয়েছি। একদিন ছিলেন ডেভিড বার্গম্যানও। আমাদেরকে যা বলেছেন যেসব তথ্য দিয়েছেন তা কি মিথ্যে? না, সবই সত্য। স্বীকার করে নিলেন ছমির উদ্দিন। এবারে ডেভিড বের করলেন রিপোর্টটি বললেন, 'তাজুল এবং আমাকে দেয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমরা একটি রিপোর্ট তৈরি করেছি। সেটি আমি পড়ে শোনাই। তারপর বলুন সেটি সঠিক কি না?' না, ছমির উদ্দিন তা শুনবেন না। তার পরও ডেভিড পড়তে শুরু করলে, মাওলানা উঠে এসে তার হাত থেকে রিপোর্টটি কেড়ে নিয়ে, আবার চেয়ারে গিয়ে বসলেন। কিন্তু রিপোর্টটি নিজেই পাঠ করলেন প্রথম থেকে শেষ অবধি। দু'একটি জাগায় দু'একটি শব্দ পরিবর্তনও করে দিয়েছেন। তারপর ডেভিডই জানতে চান রিপোর্টটি কি ঠিক আছে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ঠিক আছে।' সম্মতি দিলেন মাওলানা ছমির উদ্দিন। তা হলে কি স্বাক্ষর করবেন আপনি? না তা করবেন না। আমদের কথা হলো—হয়তো বলুন এটি ঠিক হয়নি—এসব কথা আপনি বলেন নি; আর সঠিক বললে স্বাক্ষর দিতে সমস্যা কোথায়? তার যুক্তি সাক্ষাৎকার দেবার আগেই বলেছেন—তিনি কোথাও স্বাক্ষর করবেন না। তার ছবি তোলা যাবে না এবং টেপ বা ভিডিও করাও যাবে না।

হ্যাঁ, এ রকম শর্ত দিয়েছিলেন তিনি। আমরাও টেপ করিনি, কোনো ক্যামেরাও ব্যবহার করিনি। ছবি ধারণ করা থেকে ছিলাম বিরত। কিন্তু প্রশ্ন হলো কথাগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে বা তথ্যগত ভুল না থাকলে স্বাক্ষর দিবেন না কেন? এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তিনি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবারও কথা বলেন। তখনই মুখ খোলেন হাওয়ার্ড। খুব সহজেই শান্ত করে আনেন পরিবেশ। চলে আসি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে। মাওলানা ছমির উদ্দিন যদি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হন তা হলে ক্যামেরাম্যানকে ডাকবো। ওরা বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছেন। আবার তা না করে যদি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে একটি স্বাক্ষর করেন তাতেও চলবে। আবারো বললেন কোনোটিই করবেন না তিনি। তা হলে কি তিনি স্ববিরোধীতা করছেন না? নিজের দেয়া সাক্ষাৎকারের বক্তব্য অস্বীকারতো করছেন না—তাহলে স্বাক্ষর দিতে সমস্যা কোথায়?

ক্ষেপে যান তিনি আবারো—স্বাক্ষর করবেন এবং আর কোনো কথাও বলবেন না। আমরা যেন চলে আসি। উত্তেজিত হয়ে বকাঝকাও করতে থাকেন। আবারো হাওয়ার্ড শান্ত করলেন তাকে। কথা শুরু করতে চাই। প্রশ্ন করলাম আমাদেরকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তা হলে কি মিথ্যে কথা বলেছেন? তা না হলে আগের অবস্থান থেকে

সরে আসতে চান কেন? কিন্তু একই কথা তার। স্বাক্ষর করবেন না কোথাও। টেপ করা যাবে না। ছবি তোলা বা ভিডিও করা কোনোটাই করতে পারবো না।

মাওলানা ছমির উদ্দিন কথাগুলো শেষ করে একটু যেন উত্তেজিত হলেন আবার। বললেন, 'আপনারা আমাকে আন্ডার ইস্টিমিট করেছেন ভেবেছেন গাওয়া মোল্লা। কিন্তু আমি তা নই। আপনাদের সব চালাকি বুঝি। আপনারা কেন আমার দেয়া শর্ত ভঙ্গ করলেন? না তাতো করিনি আমরা। আমরা ছবি উঠাইনি, ভিডিও করিনি। চাচ্ছি তার অনুমতি। আমাদের ক্যামেরাম্যানকে সাথেও আনিনি। তিনি অবস্থান করছেন বাইরে। মাওলানা সাহেব অনুমতি দিলেই কেবল আসবেন তারা ভেতরে। এসব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তাকে। গলার স্বর চড়িয়ে দিলেন এবারে আরো। বললেন, 'অনুমতির তোয়াক্কা তো করছেন না আপনারা। ভিডিও তো করছেনই। আপনারা কি ভেবেছেন আমায়। আমি সবই জানি—সবই বুঝি। আমাকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়।' কিন্তু আমরা তো কোনো চালাকি করিনি। গোপন নেই কোনো কিছুই। উনার অনুমতি ব্যতীত কিছুই করতে চাই না। বললেন, 'আপনাদের ঐ ব্যাগটাই তো সব ভিডিও করছে। এর মধ্যেই ক্যামেরা।' সাথে সাথে তার সামনে ব্যাগটি খুলে দেখানো হলো। কাগজ-কলম ছাড়া কিছুই নেই ভেতরে। এবারে উঠে আসলেন সামনে। ব্যাগের একটি বোতামে ধরে বললেন, 'এটিই ভিডিও করছে—আমাদের সমস্ত কথোপকথন।' ধারণ করছে চিত্র। হাওয়ার্ড তা অস্বীকার করে বললেন, সন্দেহ হলে আমাদের ব্যাগটি সরিয়ে রাখতে পারি।

চলে গেছে ঘণ্টা দুয়েক। মাওলানা ছমির উদ্দিন আর আমাদেরকে চান না। উঠতেই হবে এবারে। বিদায় নিয়ে বেরুচ্ছি। বারান্দা থেকে নামলেন হাওয়ার্ড। তারপর ডেভিড। এবারে আমি এক পা দিয়েছি সিঁড়িতে। অমনি খপ করে পেছন থেকে ধরে ফেলেন আমার হাত। বললেন, 'আমাকে প্রতারক ভাববেন না ভাই।' আমাদের মধ্যে বাংলা ভাষায় কথাবার্তা চলছে তখন। ফলে, ডেভিড বা হাওয়ার্ড বুঝেননি কিছুই। বলতে থাকেন তিনি, 'আমার এই বাড়িঘর কোটি টাকার সম্পদ। এসব ফেলে যেতে পারবো না আমি। আপনাদেরকে সাক্ষাৎকার দেবার কথাও জেনে গেছেন জামায়াত নেতারা। হুমকি দিচ্ছেন তারা আমায়। আজও ইফতারের সময় ছিলেন তাদের কয়েক। আর কোনো কথা না বলার জন্যে সাবধান করে গেছেন আমায়। অতএব আমার আর কিছুই করার ছিল না। আপনারা যা-ই ভাবেন আমায়, আমি আর কোনো সহযোগিতা করতে পারবো না। মাফ করবেন আমাকে।'

বুঝলাম প্রাণের ভয় ঢুকেছে উনার। আর ভয় করবেন না কেন? এ দলটি কি করতে পারে এবং কি করেছে—এর সবই তো জানেন তিনি। যাই হোক—নিরাপদেই বের হলাম সেখান থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে গেলাম বড় রাস্তায়। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালিক ফারুককে বাড়িতে দিয়ে সোজা চলে আসি আমরা সিলেট শহরে।

রাজাকার চায়-রাজাকারের বিচার

২৫ ফেব্রুয়ারি রাতেই রাজাকার কমান্ডার মছদ্দর আলী মষ্টির সাক্ষাৎকার ধারণ করার কথা। আমরাও গিয়েছি তার বাসস্থানে। সহজেই পাওয়া যায় তাকে। কিন্তু সে রাতে তিনি সাক্ষাৎকার দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বলেন পরের দিন তিনি ক্যামেরার সামনে বসে সব কথা বলবেন। কিন্তু পরের দিন আমরা আর বিয়ানীবাজার যেতে চাই না। শহরের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করে এ পর্যায়ের ইতি টানতে চাই। তবে, সিলেট আসতেও তিনি রাজি। তবুও ঐ রাত্রে কথা বলতে চান না। এক পর্যায়ে জানালেন, তিনি বিয়ানীবাজারে আর কোনো কথা বলবেন না। তাতে গোপনীয়তা ভঙ্গ হবার আশংকা রয়েছে। আর বাইরে প্রকাশ হলে তারও জীবনাশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

কথা হলো পরের দিন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালিক ফারুকের সঙ্গে আসবেন সিলেট শহরে। হোটেল পলাশেই দেবেন সাক্ষাৎকার। হ্যাঁ, মছদ্দর আলী মষট্টি আসলেন। কিন্তু ক্যামেরার সামনে গিয়ে শুরু করেন কান্না। অবাক বয়ে যাই আমরা। কান্না তার থামে না। প্রসঙ্গ পাল্টে নানাভাবে গল্পগুজব করে করে তাদের স্বাভাবিক করা হলো। তারপর জানতে চাই তার কান্নার কারণ। এবারে শুরু করলেন তার কাহিনী।

'আমি ছিলাম মুসলিম লীগের কর্মী। একাত্তর সালে জামায়াত মুসলিম লীগ প্রভৃতি ইসলামপন্থী দলগুলো স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। দলের কর্মী হিসেবে আমিও তাই। আমার থানায় দলের নেতারা যে সিদ্ধান্ত সে সময় দিয়েছেন আমিও তাই করেছি। শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। বচন হাজী, দুদু মিয়া, কালা মিয়া ছিলেন সক্রিয়। থানা শান্তি কমিটিতে আমার নাম দিয়েছে। আমিও অসম্মত হয়নি। যা যা করতে বলেছেন সবই করেছি। রাজাকার বাহিনী গঠিত হলে আমাকেও সে বাহিনীতে যোগ দিতে বলেছেন। আমিও রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার হয়েছি। সেই রাজাকার আল-বদর বাহিনীতে নিয়ন্ত্রণ ছিল জামায়াতের। ওদের আদেশ-নির্দেশ পালন করেছি সব সময়।'

যেসব কাজের আদেশ নির্দেশ ওরা দিতো সে কাজগুলো কি ভালো কাজ ছিল? প্রশ্ন শেষ করার আগেই আবার কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলতে থাকেন, 'একজন লোককে কিংবা পরিবার সুদ্ধ সবাইকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করাটা কি ভালো কাজ? ঘর থেকে ধরে এনে গাছে লটকিয়ে নির্যাতন করা, অন্যের মা-বোনকে জোর করে তুলে এনে গণধর্ষণ কি ইসলামের কাজ? ওরা, অন্যের বাড়ি দখল করেছে, অগুনতি মানুষ খুন করেছে শ' শ' মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে। তারপরও কি করে বলবো ভালো কাজ?' তা হলে সে কাজগুলোর সঙ্গে কেন সংযুক্ত হয়েছিলেন?

'এই যে বললাম—শান্তি কমিটি এবং রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছি দলীয় কর্মসূচি হিসেবে। আর, রাজাকার হিসেবে যত কাজ করেছি সবই ওদের আদেশে।' ওদের বলতে কাদেরকে বুঝাতে চান? মষট্টি বললেন, 'আগেই বলেছি, রাজাকার

আল-বদর বাহিনী ছিল সম্পূর্ণ জামায়াতির নিয়ন্ত্রণে। আল-বদরের কোনো কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের ধারণাই ছিল না। জামায়াতের টপ লিডার ছাড়া কেউ জানতো না তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। থানা শান্তি কমিটিতেও ছিল জামায়াতের প্রাধান্য। হত্যা তালিকা করতো জামায়াতিরাই। ঘর-বাড়ি দখল করেছে এরা। এই যে আব্দুল হক কুটুমনা, শফিক আহমদের কথা শুনতে হয়েছে আমাকে এবং আমার মতো আরো অনেককে। ওদের আদেশ পালন না করলে পরিণতি কি হতো জানেন না?' একাত্তর সালে আপনি যেসব কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যা নিজে করেছেন—'তার জন্যে কি অনুতপ্ত? আপনি দুঃখ প্রকাশ করেন?

'মন্দ কাজের জন্যে সবসময়ই অনুতপ্ত হতে হয়। দুঃখও প্রকাশ করি। কিন্তু আমার কষ্টের জাগাটা অন্যত্র। যা আপনাদের বুঝাতে পারছি না। আমি আরো খোলাখুলি বলি বিষয়টা। এই যে আমি মছদ্দর আলী মষট্টি-আমাকে দিয়ে যারা মনির মুল্লার মেয়েকে তুলে আনায়। পবিত্র বক্তবে রেখে ধর্ষণ করে। মান্নান মিয়ার স্ত্রী ধরে আনায়। এভাবে অসংখ্য অপরাধ কর্ম সম্পাদন করিয়েছে তারা তো এখনও পরম পরাক্রমশালী। একাত্তরে যেমন ছিল আমাদের নেতা—এখনও বিভিন্ন দলের নেতা। এরা নির্যাতন করে চেয়ারম্যান হয়, সাংসদ হয়। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার সব পদে বসেছে। অথচ আমি মষট্টি জেল খাটতে হয়েছে। এখনও অনেকের ঘৃণা কুড়াই। আমার প্রশ্ন আমাকে যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিতে কিংবা অপরাধকর্ম সংগঠনে বাধ্য করেছিল—তাদের কি বিচার হবে না কখনো? না কি আমার মতো মষট্টিরাই শুধু রাজাকার হিসেবে ঘৃণা কুড়িয়ে চলবে—আর আমাদের নেতারা, কমান্ডাররা থাকবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে? প্রতিটি সরকারের সময়েই গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হবে? রাঘব-বোয়ালদের বিচার কি হবে না কখনো?'

এভাবেই কাটে অনেক সময়। রাজাকার কমান্ডারের সাক্ষাৎকার ধারণ করতে গিয়ে তারই প্রশ্নের মুখোমুখি হই আমরা। একজন রাজাকারও চায় তার চেয়ে বড় রাজাকারের বিচার। শান্তি কমিটির নেতাও চেয়েছেন—আরো বড় নেতার বিচার। কিন্তু বিচার কি হবে এদের? আমাদেরও প্রশ্ন তাই। যাক, বহু চেষ্টা করে মছদ্দর আলী মষট্টিকে নিতে হয়েছে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে।

একে একে সিলেট ছাড়ে সবাই

২৬ মার্চেই আমরা সমাপ্ত করি সিলেটে চিত্র ধারণের কাজ। ঐ দিন রাজাকার কমান্ডার মছদ্দর আলী মষট্টির সাক্ষাৎকার ধারণ করার পরপরই রঞ্জনদের নিয়ে হাওয়ার্ড চলে যান সিলেট ক্যাডেট কলেজে। অন্য দিকে চললো গীতা ও ডেভিডের চলে যাবার প্রস্তুতি। আমার সাথে পরবর্তী কাজগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তারপরই ঢাকার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান তারা।

সিদ্ধান্ত হলো আগামী দু'দিনের মধ্যে সমস্ত টেপগুলোর অনুবাদ সমাপ্ত করে ১

মার্চ সেগুলো নিয়ে আমি যাব ঢাকায়। অনুবাদের কাজ করছেন তখন সুকান্ত ভট্টাচার্য মনি, দীপংকর মোহান্ত বাবলি এবং জেবা। ঐদিনও সবাইকে টেপ দিয়ে আসি। তারা টেপ থেকে অনুবাদ করছেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোরে আবার ছুটে চলি প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি। দীপঙ্কর এবং মনির নিকট থেকে টেপগুলো নিয়ে আসি। শুধু বাবলিকে দিয়েছি নতুন কিছু কাজ। অন্যদিকে কয়সর আহমদও দু'দিন থেকে করছে অনুবাদের কাজ। সে নিজে প্রচুর অনুবাদ করাতেই নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া আমি নিজেও করেছি ২৭ ও ২৮ মার্চ।

১ মার্চ আমাকে ঢাকা যেতে হবে। এর জন্যে বিমানের টিকেট যোগার করতেও ছুটাছুটি করতে হলো প্রচুর। প্রথমে টিকেট পেলাম ২ মার্চের। তারপর আবার যেতে হলো বিমান অফিস। এবারে পেলাম লাস্ট ফ্লাইটের টিকেট। তারপরও চেষ্টা করে যেতে থাকি। অবশেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা সেলিম আহমদের প্রচেষ্টায় ১ মার্চ ফার্স্ট ফ্লাইটের টিকেট পাওয়া গেল। এর মধ্যেই সমস্ত কাজ গুছিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু ২৭ ফেব্রুয়ারিতেই ঘটে আরেকটি ঘটনা। না, নতুন কোনো ঘটনা নয়। বলা যায় পুনরাবৃত্তি। রাত ১০ টার দিকে কারা আমাকে খুঁজতে আসে বাসায়। আমাকে না পেয়ে হাজেরার হাতে একটি খাম ধরিয়ে দিয়ে যায়। ভেতরে সাদা কাগজ লেখা চিঠিতে প্রাণ নাশের হুমকি। এসব নিয়ে আলাপের জন্যে ঢাকায় একটি সভা আহ্বান করা হয় ১ মার্চ। সাথে যাবে কয়সরও।

রাতে ঢাকা থেকে ফোন করেন শামীম আখতার। সেখানে ছিলেন গীতা এবং মেহেদীও। তাদের সাথেও কথা হলো। গীতা কি যেন বলতে চেয়েও বলেননি।

নাম রাখা—না রাখা

১ মার্চ। ৯টা ৫৫ মিনিটে বিমানের সিলেট-ঢাকা প্রথম ফ্লাইট। সেটিতেই কয়সর আহমদসহ ঢাকা পৌঁছি। আগে থেকেই সেখানে আছেন হাওয়ার্ড, টিম, গীতা, ডেভিড, রঞ্জন, রুচির, আহমদ, মেহেদীসহ প্রায় সবাই। একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত চাওয়া হয় সবার কাছে। আমাদের এত দিনের কাজের ফসল দিয়ে তিন যুদ্ধাপরাধীর উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মিত হবে। তাতে নাম কে কে রাখতে চান এবং কারা চান না।

একজন একজন করে সবাইকে জিজ্ঞেস করা হলো। মেহেদী-নাম রাখতে চান। মেঘনা-নাম রাখবেন। সেলিম ওমরাহ্ খানেরও আপত্তি নেই। এভাবে শামীম আখতার, আশরাফ কায়সার, আহমেদ হোসেন কারোরই আপত্তি নেই। অস্বীকৃত হলেন শুধু অনল রায়হান। তার নাম কোথাও রাখতে চান না। কয়সর আহমদকে জিজ্ঞেস করা হলে—সেও সম্মতি প্রদান করে। কিন্তু আমি?

আমাকে নিয়ে সবারই ছিল প্রশ্ন। আমার নামটা রাখা ঠিক হবে কী না? কারণ, আমি এ বিষয়ে কাজ করছি ১৫ বছর ধরে। এ প্রজেক্টেও গোড়া থেকে শেষ অবধি—কাজ করেছি একটানা। মাওলানা আবু সায়ীদ এবং মাওলানা লুৎফুর রহমানের

যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত পুরো গবেষণাটাই আমার। ওরাও আমার কাজ সম্পর্কে অবহিত। যে কারণে নানা সময়ে হুমকি-ধামকি দিয়েছে নানাভাবে। এই যে, দু'দিন আগেও বাসায় গিয়ে খোঁজ করে আমার! সব মিলিয়ে আমিই হবো ওদের টার্গেট। এ রকম ধারণা সবারই। এ অবস্থায় আমার নাম থাকা সমীচীন হবে কি? ডেভিড জানতে চান আমার মতামত।

আমার নাম ওখানে থাকলো—কি থাকলো না সে বিষয়ে আমি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ কিংবা যুদ্ধাপরাধী নিয়ে এটা আমার প্রথম কাজ নয়। নতুন কিছু বলেও মনে করি না। এর আগের ১৫ বছর ধরে যে কাজ করে আসছি তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। ১৯৮০ সালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা কাজ শুরু করার পর গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ প্রভৃতি কাজে জামায়াত-মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের নেতারা এবং শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্ বাহিনীর সম্পৃক্ততার অসংখ্য ঘটনা উদ্ঘাটন করেছি। সেই কাজেরই ধারাবাহিকতায় আমি যুক্ত হয়েছি এ কাজের। সুতরাং যুদ্ধাপরাধী, রাজাকার, আল-বদর এবং তাদের মূল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জামায়াতও আমার কাজ সম্পর্কে অবহিত। আমার সিলেটে গণহত্যা এবং অন্যান্য গ্রন্থেও রয়েছে এদের প্রত্যেকের নাম। তাদের যুদ্ধাপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা। তাই আমিও অস্বীকৃত হইনি নাম রাখতে। বললাম—নাম থাকবে আমার।

২ মার্চও আবার সভা বসে। সেখানেও এ বিষয়ে আলাপ হয়। অনল ব্যতীত সবাই নিজের নাম রাখতে সম্মত হন। তবে আমার নামটি অনেকগুলো নামের মাঝে এমনভাবে লিখা হয়েছিল যেন একেবারেই গুরুত্বহীন।

দেশের বাইরে যাবার প্রস্তাব

১৯৯৪ সালের আগস্টে এ কাজ শুরু করার পর থেকে আর পেছন ফেরে তাকাতে পারিনি। নিজের ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনাও করিনি কখনো। কিন্তু ডেভিডরা এ বিষয়ে তখনই ছিলেন উদ্বিগ্ন। যদিও সব ঘটনা ওদেরকে বলিনি আমি কখনো। বিয়ানীবাজারের উপজেলা রেস্টহাউসে আক্রান্ত হবার কথাও জানাইনি। তা করলে হয়তো ওরা-কেউই বিয়ানীবাজার যেতে রাজি হবেন না। আর আমাকেও বারণ করতেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি সড়কের বাজারে চিত্র ধারণ করার কালেই এক পর্যায়ে হাওয়ার্ড বললেন, 'আমাদের প্রামাণ্য চিত্রটি প্রদর্শনের আগেই তোমাকে বাইরে চলে যেতে হবে। অন্যথায় ওরা তোমার উপর আক্রমণ করতে পারে।' এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যাওয়াই শ্রেয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এর আগের দিন রাতে-অনুষ্ঠিত ডিনার পার্টিতেও গীতা নাকি আমার স্ত্রী হাজেরাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জানতে চান হাজেরা ইংল্যান্ড যেতে চায়

কী না? কারণ হিসেবে বলেন, 'তাজুল কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে চলে যেতে হবে। অবস্থানও করতে হবে অনেক দিন।' উত্তরে হাজেরা জানিয়েছিল—সে তার স্কুল থেকে ছুটি পাবে না।

১ মার্চ। ঢাকায় আবার কথাটি উত্থাপন করেন হাওয়ার্ড। আসলে চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভির মোকাম্মেলের কাছে এ ব্যাপার পরামর্শ চেয়েছিলেন তিনি। হাওয়ার্ড দু'টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেদিন। এর একটি হলো—সিলেট না ফিরে লম্বা সময়ের জন্যে আমাকে ঢাকায় আত্মগোপন করে থাকতে হবে। দ্বিতীয় বিকল্প হলো ইংল্যান্ড চলে যাওয়া। এ ব্যাপারে আমি আসলেই আগে থেকে কোনো চিন্তা-ভাবনা করিনি। অতএব সময় নিয়ে একটু ভেবে দেখতে চাই।

একে একে তো প্রায় সবই চলে গেছেন। ঢাকায় অবস্থান করছেন শুধু ডেভিড। আমি সিলেটে। ৬ মার্চ সকালে ফোনালাপ হলো আমাদের মধ্যে তারপর দুপুরে আবার। পরের দিনই তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন। সেখানে যাবার পর লুৎফুর রহমান, আবু সায়ীদ ও চৌধুরী মঈনুদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ উল্লেখ করে চিঠি দেয়া হবে। এই তিন যুদ্ধাপরাধী চিঠি পাবার পর আমার সমস্যা হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাই, আমি যেন সিলেটে অবস্থান না করি। তা হলে কোথায় যাব আমি? ডেভিড এ বিষয়েও তার পরামর্শ তুলে ধরেন। বললেন, ঢাকায় চলে যেতে হবে আমাকে। পরবর্তী কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকতে হবে সেখানেই। এর জন্যে কিছু টাকাও রেখে যাচ্ছেন ড. মেঘনা গুহঠাকুরতার কাছে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক) বললেন, পরের দিন আবার ফোন করবেন শুধু বাই বলার জন্যে। আর, এতদিনের কাজের জন্যে বার বার ধন্যবাদ দিতে থাকেন তিনি। সে দিন হঠাৎ কেন যেন আমার মনে হয়েছিল—আমি একা হয়ে গেছি।

১লা মার্চ ঢাকাতে এ ব্যাপারে একটি আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। শাহরিয়ার কবির, তানভীর মোকাম্মেল, সারা হোসেন, হামিদা হোসেন, ড. রেহমান সোবহান, মেঘনা গুহঠাকুরতাসহ আরো অনেকে ছিলেন আমাদের পুরো টিমের সঙ্গে। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সৃজনশীল প্রকাশক মফিদুল হক ছিলেন কী না নিশ্চিত মনে পড়ছে না আমার। আমি সেখানে পৌঁছার আগেই একটি সিদ্ধান্ত নেন তারা। পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চাইতে হবে। কিন্তু সব শোনার পর আমিই ভিন্ন মত প্রকাশ করি। জানালাম পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চাইতে গেলে ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য তুলে ধরার পর ঐ সিদ্ধান্তটা বাতিল করা হয়। পরে ঠিক হলো বিষয়টি নিয়ে এ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সে অনুযায়ী ব্যারিস্টার সারা হোসেন ও ডেভিড বার্গম্যান দেখা করেন তার সঙ্গে। সব শুনে তৎকালীন এ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার আমিনুল হকও দেশের বাইরে চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এর পর থেকেই ডেভিড আরো সিরিয়াস হন—বিষয়টি নিয়ে। তাড়াতাড়ি আমাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাবার প্রক্রিয়া চালাতে থাকেন—অন্যান্য কাজগুলোর

পাশাপাশি। প্রামাণ্য চিত্রের কাজ সমাপ্ত করার মতো সমান গুরুত্ব দিয়ে চালিয়ে যান-এ প্রচেষ্টাও। গীতাও তাই করেছেন। ফলে, দেশত্যাগ করতে হলো এক সময়। তারপর থেকেই বাস করছি দেশের বাইরে। এই বাইরে বাস করাটা আমার জন্য যে কত কষ্টকর তা কাউকে বুঝাতে পারবো না আমি কখনো।

নেতৃবৃন্দের পরামর্শ

আমাকে মৌলবাদিরা, জামায়াতিরা সব সময়ই হুমকি দিয়ে আসছে। কিন্তু কাউকে কখনো তা বলিনি। আর, বলেই বা কি লাভ? আমার গ্রন্থ 'সিলেটের যুদ্ধকথা'র একটি প্রকাশনা অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল। আর প্রধান অতিথি হিসেবে জাহানারা ইমামের উপস্থিতিও ছিল নিশ্চিত। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিবিদেরাই সেদিন বিরোধিতা করেন অত্যন্ত সংকীর্ণ স্বার্থে। শহীদ জননীর পাশে মঞ্চে বসতে পারবেন না বলেই তাদের সে অবস্থান। এমন কি একজন নেতা জামায়াতকে ফোন করে বলেছিলেন এ অনুষ্ঠান হবে না; হতে পারবে না। অতএব আন্দোলন করে তারা এর কৃতিত্ব নিতে পারে। তারপর বিভিন্ন ব্যানারে জামায়াতও নামে রাস্তায়। অবশেষে অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছিল।

তারপরও এবারে দু'জন লোককে বলতে চাই আমি। এর মধ্যে প্রধান রাজনীতিক, মুক্তিযুদ্ধের বীর সংগঠক, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজী (মরহুম) একজন। বাসায় গিয়ে জানালাম সমস্যার কথা। সব শুনে থানায় একটি জিডি করতে বলেছেন। তিনি নিজেই আমাকে নিয়ে যেতে চান থানায়। কিন্তু সম্মত হইনি আমি। কারণ, পুলিশ আমাকে কতটা সহায়তা দেবে—সে বিষয়ে ছিলাম সন্দিহান। তাছাড়া আমার সর্বশেষ কাজের কথাও প্রকাশ করতে চাইবো না আমি। তাতে সমস্যা আরো বাড়তে পারে। তাই বিনীতভাবে তাকে বলি রাজনৈতিকভাবে কিছু করার থাকলে করবেন। পুলিশের কাছে যেতে চাই না আমি।

৭ মার্চ শহীদ সুলেমান হলে ছিল আওয়ামী লীগের সভা। প্রধান অতিথি সেখানে আওয়ামী লীগ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য বিরোধী দলীয় উপনেতা, সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ (মরহুম)মঞ্চে গিয়ে তার পাশে বসে জানালাম জামায়াতের হুমকির কথা। তাৎক্ষণিক উপদেশ দিলেন—থানায় গিয়ে নিরাপত্তা চাইতে। অবশ্যি, দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেবের সঙ্গে কথা বলারও তার। পাশেই দেওয়ান ফরিদ গাজী। তিনি শুনছেন সবই। বললেন তাঁর সাথে আমার আগেই আলাপ হয়েছে। যাই হোক, একই বক্তব্য আমার। পুলিশের সাহায্য নিতে চাই না।

আমার সুহৃদ এবং অভিভাবক তুল্য ব্যক্তি আব্দুল হামিদ। গনতন্ত্রী পার্টির জেলা সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। সুখে-দুঃখে শরণাপন্ন হই তাঁর। তিনিও পাশে দাঁড়ান—সব সময়। অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমায় আব্দুল হামিদ

(মরহুম)। আমার উপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। পরের দিনই গেলাম কদমতলিস্থ তার বাড়িতে। শুনলেন আমার কথা মনোযোগ দিয়ে। বললেন, 'আপাতত সিলেটে অবস্থান করাটা সঠিক হবে না। তার পরামর্শ আমি যেন ঢাকায় চলে যাই। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এছাড়া আর, কি করা যায় তা নিয়েও ভাববেন তিনি। দেশের বাইরে কোথাও গিয়ে থাকার ব্যবস্থা থাকলে যেন সে চেষ্টাও করি।

১২ মার্চ। মঈনুল ইসলাম এবং মোস্তফা কামাল মস্তই এসে নিয়ে যান আমায় মইনুল ইসলামের বাসায়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন গোরা, এনাম আহমদ এবং শামসুদ্দোহা। জানতে চান তারা আমার কাছ থেকে। কিছু আলোচনাও হয়। তারপর একটি সভা আহ্বান করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তারা। অবশ্যি এ রকম কোনো সভা হয়েছিল বলে আমি আর শুনিনি। খোঁজও নেইনি আমি নিজে থেকে। বরং আমার ঘনিষ্ঠ কোনো কোনো বন্ধু করেছেন বিরূপ মন্তব্য। ছড়িয়েছেন নানা কুৎসা। দেশের বাইরে বসে বসেও শুনেছি এসব আমি। কিন্তু প্রতিবাদ করিনি—কারো কোনো বক্তব্যের। কানেও নেইনি—এসব আমি। বরং এ সময়টুকু ব্যয় করতে চেয়েছে সৃষ্টিশীল কোনো কাজে। প্রশ্ন উঠতেই পারে—ফলপ্রসূ কিছু করতে সমর্থ হয়েছি কী না। সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে অপারগ। আর, সে সময়ও সম্ভবত হয়নি। ভবিষ্যৎ গবেষকরাই শুধু বলতে পারবেন তা।

সমস্যা হলে কোলকাতা

এক সময় প্রায় সবাই একমত হলেন যে, সিলেটে আমার অবস্থান করা ঠিক হবে না। ঢাকাতেই অবস্থান করতে হবে। আর, সেখানেও নিরাপদ বোধ না করলে কিছু দিনের জন্যে চলে যেতে হবে ভারতে। ভারতের কোথায় উঠবো কোথায় থাকবো, এসব প্রশ্নতো অবশ্যি সামনে আসবে? ডেভিডরাও চিন্তা ভাবনা করতে থাকলেন এ নিয়ে। এক সময় যোগাযোগ করেন রঞ্জন পালিতের সঙ্গে। তাকে জানানো হলো সব কথা। যে কোনো মুহূর্তে দেশের বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে আমি সেখানে চলে যাবো। তারপর বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবো। এর জন্যে একটি বাসা তাৎক্ষণিক ভাড়া নিতে হবে। প্রয়োজনে রঞ্জন যেন নিজের নামেই ভাড়া নিয়ে নেয়।

রঞ্জন পালিত ছিলেন ঢাকায়। ক্যামেরার কাজ করেছেন। আমাকে জানেন তখন থেকেই। আমার সমস্যার কথাও তার অজানা নয়। তাই সাহায্য করতে এক পায়ে খাঁড়া। বলেন আগে থেকে বাসা ভাড়া করে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না তিনি। কারণ, আদৌ কোলকাতা যাবার প্রয়োজন হবে কী না এবং প্রয়োজন হবার আগেই যে লন্ডন চলে যাবো না—তারও নিশ্চয়তা নেই। এর পরও যদি কোলকাতা চলে যাই আমি—তা হলে তার বাসাতেই থাকতে পারবো—অন্য কোনো ব্যবস্থা না হওয়া অবধি।

কথা হয়ে থাকলো সেটিই। যদি কখনো প্রয়োজন পড়ে তা হলে সোজা যেন কোলকাতা চলে যাই। সেখানে গিয়ে তার বাড়িতেই উঠতে হবে। এমন কি তিনি কোলকাতা বা দেশের বাইরে থাকলেও। পরিবারের অন্য সদস্যদেরকেও আমার কথা বলে রাখবেন তিনি। ঠিকানাটা যেন আমি সব সময়ই সাথে রাখি। সব কথা ঠিক হয়েই থাকলো। ব্রিটেনের ভিসা হবার আগে যদি দেশের বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়—তাহলে চলে যাবো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোলকাতা। সেখানে গিয়ে উঠবো রঞ্জন পালিতের বাড়িতে। সেখান থেকে যোগাযোগ করবো ডেভিড বার্গম্যানের সাথে। তারপর ভিন্ন ব্যবস্থা।

প্রথমে আমার কর্মস্থল সিলেট ত্যাগ। এর মাধ্যমে হয়ে পড়ি কর্মহীন। সাথে সাথে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক সমস্যা। তারপর প্রশ্ন হলো—ঢাকায় লুকিয়ে থাকবো না দেশের বাইরে চলে যাবো? দেশের বাইরে মানে কি কোলকাতা—না লন্ডন?

দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি

৭মার্চ ডেভিড বার্গম্যান ঢাকা ত্যাগ করেন। এর আগে বলেছিলেন—প্রফেসর ড. মেঘনাগুহঠাকুরতার কাছে আমার জন্যে কিছু টাকা রেখে গেছেন। কিন্তু মেঘনা অসুস্থ। তিনি জানান ডেভিডের সঙ্গে দেখা হয়নি—ওর ঢাকা ত্যাগের আগে। এর মানে তার কাছে কিছুই রেখে যাননি। ফোনে কথা হলো—ব্যারিস্টার সারা হোসেনের সঙ্গে। তিনি আমাকে শীঘ্রই ঢাকা চলে যাবার পরামর্শ দেন। কিন্তু সিলেটে তখন কিছু জরুরি কাজ ছিল। বৃহত্তর সিলেট ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন, ড. রতন লাল চক্রবর্তী, ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রমুখদের সঙ্গে মিটিং করার প্রস্তুতি চলছিল। এসব শেষ করে ঢাকা পৌঁছাই ১৫ মার্চ। কিন্তু সারা তখন একটি অনুষ্ঠানে চলে গেছেন। পরের দিন সকাল বেলাতেই দেখা হয় তার সঙ্গে। বেইলি রোডে তাদের বাড়িতে বসেই আলাপ। জানালেন ঠিক পরের দিনই তিনি যাচ্ছেন লন্ডন। সেখানে তিনি আমাদের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আলাপ করবেন ডেভিড বার্গম্যানের সঙ্গে। সারা জানান ডেভিড হয়তো আমার জন্যে কিছু টাকা রেখে গেছেন। বলেই একটি খাম বের করে দেন। স্টেপলার করা খাজ খুলে ঠিকই পেলাম কিছু টাকা। যা দিয়ে কয়েকদিন চলবে আমার।

খাম সংক্রান্ত আলাপ শেষেই আসে ভিসার প্রশ্ন। ব্যারিস্টার সারা জানান, ব্রিটেনের ভিসা পাওয়ার জন্যে ডেভিড একটি আমন্ত্রণ পত্র পাঠাবেন একই সাথে থাকবে—টিকেট সংক্রান্ত আরেকটি চিঠি। কোথা থেকে, কোনো এয়ারলাইন্সের টিকেট করতে হবে—সবই উল্লেখ থাকবে সেখানে।

তৃতীয়ত : আমার ভিসা সংগ্রহ এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে আমাকে সহায়তা দেবেন তৌহিদ রেজা নূর। তাকেও ডেভিড তা বলে গেছেন। যাতে আমার কোনো সমস্যা না হয়। ওর সাথে যোগাযোগ রাখতে বলেন সারা হোসেন।

ভিসা এবং টিকেট হয়ে যাবার পরই বিলম্ব না করে যেন চলে যাই লন্ডন। তখন প্রয়োজন হবে এয়ারপোর্ট ট্যাক্স। এই অর্থ এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য খরচ নির্বাহ করার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা রয়েছে ড. মেঘনা গুহঠাকুরতার কাছে। আমাদের আলোচনার ৫ম বা সর্বশেষ দফা ছিল দেশ ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত অবস্থান। সারা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই সময়ে কোনো ভাবেই সিলেট অবস্থান করা ঠিক হবে না। তাই, ঢাকাতেই থাকতে হবে। আর, ঢাকায় থাকা কালে অর্থ বা অন্য যে কোনো প্রয়োজনে ড. হামিদা হোসেনের (সারার আম্মা) সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এ ছাড়াও মেঘনা বা সুপ্রিয় চক্রবর্তী রঞ্জু এডভোকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। ব্যারিস্টার সারার অফিসে যোগাযোগ করলেও সমাধান পাওয়া যাবে।

১৭ মার্চ ব্যারিস্টার সারা লন্ডন পৌঁছার পর ড. হামিদা হোসেনকে ১৯ মার্চ জিজ্ঞেস করেছিলাম—সেখান থেকে কোনো সংবাদ এসেছে কী না। কিন্তু না, তিনি এখনো কোনো তথ্য পাইনি। তবে, বিকেলেই লন্ডন থেকে ঢাকা ফিরছেন ড. কামাল হোসেন। তার বিশ্বাস উনার সাথে নিশ্চয়ই কোনো সংবাদ আসবে। কিন্তু উনার ফ্লাইট আসেনি সেদিন। পরেরদিন ঠিকই আসলেন ড. কামাল হোসেন। তবে, নিশ্চিত হবার মতো কোনো সংবাদ নেই। জানালেন, ওরা তখনও ঠিক করতে পারেনি—কি করা উচিত এবং কিভাবে তা করতে হবে। তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, খুব শীঘ্রই ওরা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জানাবে।

আমি আছি আত্মগোপন করে। যোগাযোগ রয়েছে ড. হাসিনা হোসেনের সঙ্গে। সময়-সময় তিনিই জানাতেন আমায় টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশন গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। এই যেমন ২৩ মার্চ—ফোনে কথা বলি আমি। জানালেন, তার কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে, ঐ রাতেই ফোন করবেন এবং হয়তো ভালো কোনো সংবাদ পাবেন। কিন্তু পরের দিনও তেমন কোনো সংবাদ পাননি তিনি। ওরা বলেছে খুব শীঘ্রই একটা সুসংবাদ দিতে পারবে। ড. হামিদা হোসেন প্রতিদিন অন্তত একবার ফোন করতে বলেন আমায়। কারণ, যে কোনো সময় ফোন পেতে পারেন তিনি লন্ডন থেকে। আর, যেহেতু আমার ফোন নেই, অফিসও করি না, কখন কোথায় থাকি—তারও ঠিক নেই, তাই, ফোন করে আমাকেই সংবাদ নিতে হবে। যাক, কথা হলো—তানভীর মোকাম্মেলের সঙ্গে। তিনিও উদ্বিগ্ন আমার ব্যাপারে। তবে, ডেভিডের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। আলাপ হলে জানাবেন আমায়।

আমি আবার সিলেটে। ৩০ মার্চ ফোন করি ঢাকায়। ড. হামিদা হোসেন বললেন—লন্ডনে আলাপ হয়েছে তাঁর। ওরা বলেছে দু'তিন দিনের মধ্যেই আমন্ত্রণ পত্র পাঠাবে। তবে, আমি যেন তখনই আবার ঢাকা ফিরে যাই। না, তখনই যেতে পারিনি। এখানে পৌঁছলাম ১ এপ্রিল রাতে। ২ এপ্রিল সকালে বাড়িতে গেলে ড. হামিদা হোসেন বের করে দেন ডেভিড বার্গম্যান ও ক্লুডিয়া মিলনের চিঠি।

ফ্যাক্সযোগে এসেছে তাদের আমন্ত্রণ পত্র। তবে, সাথে কোনো টিকেট নেই। যোগাযোগ করে জানতে পারি টিকেট ঢাকা থেকেই পাবো আমি। এভাবেই চলে আমার অপেক্ষার প্রহর গোনা। একই সঙ্গে কিছু লোকের সহযোগিতা। ৩ এপ্রিলেও তানভীর মোকাম্মেল, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং মফিদুল হক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মফিদুল হক তো আবার বইয়ের রয়েলিটি বাবদ দেয় অর্থের হিসেব কষে একটি চিঠিও দিয়েছিলেন।

হাজেরাও আসে ঢাকায়। চললো আমার প্রস্তুতি। ঠিক হলো ৬ এপ্রিল, ঢাকাস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসে যাবো ভিসার জন্যে। সে সময় হয়তো আমারও একটা উচ্চ ধারণা হয়ে যায়—ভিসার ব্যাপারে। টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশন থেকে আমন্ত্রণ করেছে আমাকে। একজন কনস্যালট্যান্ট হিসেবে কাজ করবো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর কি আর আমাকে ভিসা না দিয়ে পারে? কিন্তু আমার সে ধারণা যে কত অমূলক তা অনুধাবন করতে পারিনি সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত।

ভিসা লাভের প্রচেষ্টা

ক্লুডিয়া মিল্‌নের আমন্ত্রণ লাভের পর মনে হয়েছিল দূতাবাসে যাবার সাথে সাথেই আমাকে ভিসা দিয়ে দেবে। ৬ এপ্রিল ভোরে উঠে রওয়ানা করি ঢাকাস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসে। আমার স্ত্রী হাজেরা এবং শ্যালক কয়সর আহমদও ছিল সাথে। ভেতরে গেলাম সাড়ে ৭ টায়। সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ভিসা অফিসারের মুখোমুখি হতেই ধাক্কা খেলাম বাস্তবতার। জানালেন, আমার ফাইলে তো কোনো কন্ডাক্ট পেপার নেই। টুয়েন্টি টুয়েন্টি থেকে কন্ডাক্ট পেপার সংগ্রহ করে তা সাথে নিয়ে হাজির হতে হবে ১০ অথবা ১৩ এপ্রিল। সেদিনই হবে আমার ইন্টারভিউ। সুতরাং ফিরে আসতে হলো আমায়। ড. হামিদা হোসেনকে জানালাম সংবাদ। তারপর ফিরে আসি আবার সিলেট।

১০ এপ্রিল রাতে ডেভিড বার্গম্যান ড. হামিদা হোসেনকে জানিয়েছেন—পরের দিন ফ্যাক্স পাঠাবেন আমায়। সুতরাং ঢাকা চলে যেতে হবে আমাকে। ১১ এপ্রিল রাতেই রওয়ানা করি। তখন আবার স্কপের ডাকে ৪৮ ঘণ্টা অবরোধ চলছিল। এর সমর্থনে বামফ্রন্টের সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। পরদিন সকালেই আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে ডেভিডের চিঠির ফটোকপি সংগ্রহ করি। তারপর ড. হামিদা হোসেন দিলেন অরিজিনাল চিঠি।

১৩ এপ্রিল সকাল ১০ টায় গিয়ে হাজির হই দূতাবাসে। কিছুক্ষণ পরই শুরু হয় আমার ইন্টারভিউ। ৪৫ মিনিটের ইন্টারভিউ শেষে জানালো—যেহেতু আমি টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশনের কনস্যালট্যান্সি ওয়ার্কের জন্যে যাচ্ছি সুতরাং আমার ওয়ার্ক পারমিট প্রয়োজন হবে। ভিসা দেয়নি আমায়। রিফিউজ করে বলে—ওয়ার্ক পারমিট পাঠালে তা নিয়ে আবার যেতে পারবো।

১৪ এপ্রিল সকালে ব্যারিস্টার সারা ফিরেছেন দেশে। একটু পরেই ফোন করি আমি। তাদের বাড়িতে যাবার জন্যে আহ্বান জানান আমায়। ১২ টার দিকে যখন পৌঁছলাম তখন তিনি ঘুমে। আলাপ হলো ড. হামিদা হোসেনের সঙ্গে। ইতোমধ্যে আলাপ করেছে তিনি লন্ডনে ডেভিড বার্গম্যানের সঙ্গে। তিনি জানিয়েছেন—গীতা সায়হালের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। ঠিক করবে সরাসরি ঢাকাস্থ সে দেশের দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলবেন না—অন্য ব্যবস্থা নেবেন।

আমার একটা বড় সমস্যা ছিল তখন ফোন না থাকা। কারণ, আমি তো তখন নির্দিষ্ট কোনো স্থানে বাস করছি না। আজ এখানে তো কাল ওখানে। অফিস করি না বলে অফিসের ফোনটাও ব্যবহার করতে পারি না।

মোবাইল ফোনের কথা তো তখনও শুনিনি। সুতরাং লন্ডনে সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাই, ভায়া হয়েই সব সংবাদ হতো আদান-প্রদান। ১৭ এপ্রিল আবার ব্যারিস্টার সারা হোসেন জানালেন—সর্বশেষ সংবাদ। বললেন, লন্ডন থেকে আরো কিছু কাগজ পত্র এসেছে। দেশ থেকেও চলেছে যোগাযোগ। অতএব আমি যেন ঢাকাতেই অবস্থান করি।

১৯ এপ্রিল কথা হলো ডেভিডের সঙ্গে। জানা গেল গীতা এবং ডেভির দু'জনই দু'টি চিঠি পাঠিয়েছেন। আর, ব্যারিস্টার সারাও এখানে যোগাযোগ করেছেন। তাই, ২০ এপ্রিল সকাল থেকেই বসে থাকি ড. কামাল হোসেনের অফিসে। কিন্তু আমার কোনো ফ্যাক্স আসেনি। সন্ধ্যে বেলাতেই সিলেট থেকে পেলাম একটা সংবাদ। আমার স্ত্রী জানালো ঢাকাস্থ ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে একটি চিঠি এসেছে। তাতে লেখা হয়েছে আমার ভিসার আবেদন প্রসঙ্গে দূতাবাস সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। অতএব যে কোনো ওয়ার্কিং ডেতে সকাল ১১টার আগে গিয়ে আমি যেন ভিসা নিয়ে আসি। জানালাম তা ব্যারিস্টার সারাকে। কিন্তু চিঠিটা দেখা দরকার না দেখে কেউ কিছু বলতে পারে না। সারাও বললেন, চিঠি দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে। তাই, রাতের ট্রেনেই রওয়ানা করি সিলেট।

২৪ এপ্রিল পেলাম ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে আরেকটি চিঠি। কে. সিমশন, সেকেন্ড সেক্রেটারি, ইমিগ্রেশন স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়-১৩ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের ভিসার জন্যে আমি সাক্ষাৎকার দেই। কিন্তু সেদিন ওরা আমাকে ভিসা দেয়নি। পরে তারা নিজেরাই তাদের সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। অতএব, এই চিঠি এবং পাসপোর্টসহ যে কোনোদিন সকাল সাড়ে ৭টায় গিয়ে যেন ভিসা নিয়ে আসি।

এবার কি ভিসা হবে? জানি না। তবে, ঢাকায় চলে যেতে হবে। ভাবছিলাম, ভিসা হয়ে গেলে সিলেট ফিরে গোপনে গোপনে আমার সব কিছু একটু গোছগাছ করে সপ্তাহ দু'য়েক পরে ফ্লাই করবো। এসব ভেবে ভেবেই আবার রওয়ানা করি ঢাকায়। কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত। আত্মগোপন করে করে থাকা। তারপর আবার ঢাকা-সিলেট,

সিলেট-ঢাকা করা। আর ভালো লাগছিল না। এবার ভিসা না হলে চলে যাব কোলকাতা। সেখানে থাকবো কিছুদিন। অন্তত নির্বিঘ্নে কাটাতে পারবো দিনরাত।

পেয়ে গেলাম ভিসা

যুক্তরাজ্যের দূতাবাস। যুক্তরাজ্য থেকেই যোগাযোগ হয়েছে সেখানে। ব্যারিস্টার সারা নিজে আমাকে না বললেও তিনিও এখানে কাজ করেছেন। সব মিলে একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে দূতাবাসের ইমিগ্রেশন বিভাগ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে চিঠি পাঠিয়েছে। তা হলে চলে যাই ঢাকা। দেখি এবার কি হয়? ২৬ এপ্রিল খুব ভোরে পৌঁছাই সেখানে। প্রথমেই ফোন করি সারাকে। জানালাম পৌঁছার খবর। কথা হলো ৯টায় দেখা হবে আমাদের। তাই চলে যাই ড. কামাল হোসেনের চেম্বারে। কিন্তু ১১ টা পর্যন্তই আসেননি তিনি। অন্যদিকে ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে আমার। তাই, একটু বিশ্রাম নিতে চলে যাই হোটেলে। বিকেলে আবার অফিসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর এক সাথে এসে পৌঁছাব সারা হোসেন এবং তৌহিদ রেজা নূর।

ব্যারিস্টার সারা জানালেন, দূতাবাস থেকে বার বার ফোন করেছে অফিসে। বলেছে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। পাসপোর্ট এবং চিঠি সাথে নিয়ে গেলেই ভিসা হবে। তারপরই ঠিক হলো পরের দিন যাবো দূতাবাসে। সকাল বেলা চলে যাই সারাদের বাড়িতে। সেখানেই নাস্তা পর্ব সম্পন্ন করি। তারপর আমার পাসপোর্ট ও টিকেট নিয়ে সারাসহ ফিরি তার অফিসে। সাড়ে ১০ টায় ফোন করেন তিনি-দূতাবাসে। জানালেন, 'তাজুল মোহাম্মদকে পাওয়া গেছে। ওরাও বলে—তাৎক্ষণিক চলে যেতে। সাথে সাথেই রওয়ানা করি আমি। যখন পৌঁছলাম সেখানে—তখন তো দূতাবাস বন্ধ হবার সময়। জিজ্ঞেস করলো আমার স্ত্রী কোথায়? বললাম ওর ছুটি নেই। যাবে না আমার সাথে। ৫ মিনিটের মধ্যে ভিসা দিয়ে বিদেয় দেয় আমায়।

পেছনে ফিরে দেখা

যুক্তরাজ্যের ভিসা হয়েছে। ঠিক পরের দিনের টিকেট আমার হাতে। চেষ্টা-তদবির করে একদিন পরের টিকেট কনফার্ম করাই বিমানের। তারপর কাপড়-চোপড় নিয়ে যাবার জন্যে রওয়ানা করি সিলেট। এ কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্ত হয়েছেন অনেকে। সাহায্য করেছেন নানাভাবে। গবেষণা সহযোগী হয়েছিল কয়সর আহমদ। আরো অনেকেই সহায়তা করেছেন কাজের নানা পর্যায়ে। একদিন পর ভালোয় ভালোয় বিমানে চড়তে পারলেই নিরাপদ। কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে ওদেরও কারো কারো সমস্যা তো হতে পারে।

মনে পড়ে খসরুর বাবার কথা। অমনিই চোখের সামনে ভেসে উঠে ভদ্রলোকের অসহায় চেহারা। খসরুর ভালো নাম-খসরুজ্জামান খসরু। বাড়ি কানাইঘাট থানায়। জামায়াত তৈরির কারখানা হিসেবে খ্যাত থানায় জন্মেও ওদের প্রভাব থেকে ছিলেন

সম্পূর্ণ মুক্ত। উপরন্তু আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের মাধ্যমেই পা রাখেন রাজনীতির জমিনে। এক সময় জেলা পর্যায়ে ছাত্রলীগের প্রথম সারির একজন নেতায় পরিণত হন তিনি। নির্বাচিত হন এম.সি. কলেজ ছাত্র সংসদের ভি.পি। এক সময় জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির কলেজে শুরু করে তাণ্ডব। ছাত্রী মিলনায়তনে ঢুকে নির্যাতন চালায় ছাত্রীদের উপর। সেদিন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মেয়েদের ইজ্জত রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েন খসরু। ফলে, শিবির সন্ত্রাসীদের সকল ক্ষোভ এসে পড়ে তার উপর। অমানুসিক অত্যাচার চালায় খসরুর উপর এবং সব শেষে কেটে ফেলে একটি হাত। এরপর চিকিৎসার জন্যে লন্ডন গিয়ে সেখানেই বাস করছেন খসরু। তার বাবা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। বলেছেন, একাত্তরে জামায়াতে ইসলামির পাপাচারের অনেক কাহিনী। কিন্তু যেদিন আমরা ভিডিও করতে যাই সেদিন বুঝলেন তিনি ইংল্যান্ডের টেলিভিশন চ্যানেলে প্রদর্শিত হবে এসব। তিনি জানেন, জামায়াতে ইসলামের বহু বড় বড় নেতা বাস করেন ইংল্যান্ডে। রয়েছে ওদের ক্যাডার বাহিনী এবং কার্যক্রম তা হলে ওরা যদি ছেলের কোনোও ক্ষতি করে? ভয়ে কেঁপে উঠেন তিনি। এক পর্যায়ে বুক ফেটে বেরিয়ে আসে তার কান্না। তারপর ক্যামেরার সামনে কথা বলতেও চাননি আর।

আওয়ামী লীগ নেত্রী সৈয়দা জেবুন্নেছা হকও (মহিলা আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ) কথা বলতে চাননি প্রথমে। পরে ইংল্যান্ডে অবস্থানরত তার স্বামীর সাথে কথা বলে উনার অনুমতি নেবার পর তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। শহরে আরো কত লোক ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও প্রকাশ করতে চাননি প্রাণের ভয়ে। কিন্তু শাব্বীর জালালাবাদী, বশির আহমদ, এডভোকেট আব্দুর রকীবসহ অনেকেই নিয়েছে সে ঝুঁকি। ক্যামেরার সামনে বসে অকপটে বলে গেছেন জামায়াতে ইসলামী নৃশংসতার কাহিনী। মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান খান মাহতাব (জঙ্গী মাহতাব মরহুম), মুক্তিযোদ্ধা সেলিম আহমদ, এডভোকেট সুপ্রিয় চক্রবর্তী, এডভোকেট সুলতানা কামাল, আব্দুল মালিক ফারুক, ফরিদ আহমদ নানু, আনিসুল আলম, নজরুল ইসলাম, নূরুল আম্বিয়া চৌধুরী, জমির উদ্দিন প্রধান, ডা. ফয়জুল হক, রফিক উদ্দিন তোতা মিয়া, আব্দুল বাতিন মাস্টারসহ অনেকের সহায়তার কথাই তো বাইরে প্রকাশ পেয়েছে। তাদেরও ক্ষতি করতে পারে জামায়াত। এছাড়া সাক্ষাৎকার দাতাদের কারো কারোর কথাও গোপন থাকেনি। সমস্যা তো তাদেরও হতে পারে। যদি কখনো এমন হয় তা হলে এর দায় ভার আমার উপরও বর্তাবে না কিছুটা? আমার পালিয়ে যাওয়াটা কি খুব স্বার্থপরের ন্যায় সম্পন্ন হচ্ছে না? ওরা তো কেউ জানতেও পারবে না যে আমি পালিয়ে গেছি দেশের বাইরে। কাউকে জানাবারও সময় এবং সুযোগ কোনোটাই নেই আমার।

বিগত ক'মাস ধরে এ কাজ করার সময় সাহায্য করেছেন অনেকে। দেওয়ান ফরিদ গাজী (মরহুম), আব্দুল হামিদ (মরহুম), এডভোকেট শাহ মোদ্দাবির আলী

মানিক, আব্দুল আজিজ মাস্টার, এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরী, গুলজার আহমদ, রফিকুর রহমান লবু, এডভোকেট মনিরউদ্দিন আহমদ, আ.ফ.ম. কামাল, মামুক উদ্দিন আহমদ, জিয়া উদ্দিন লালা, মোহাম্মদ ফারুক আহমদ, আশফাক আহমদ (উপজেলা চেয়ারম্যান), মকসুদ বক্স্, হাজী আব্দুস সালাম, এডভোকেট আব্দুল মালেক, দীপংকর মোহান্ত, সিরাজ উদ্দিন, শফিক উদ্দিন কাজল, মইনুল হোসেন, শাহ আজিজুর রহমান, ডা. মইন উদ্দিন জায়গীরদার, কামরুজ্জামান, সাইফুর রাজ্জাক কিনু (মরহুম) এখলাছুল মোমিন, ফয়জুল হক চৌধুরী, বাবুল, হেরাল্ড রশীদ চৌধুরী, নজির আহমদ চৌধুরী (মরহুম), মসলেহ উদ্দিন আহমদ, আব্দুল বাতেন তাপাদার এবং আরো কতজন। তাদের প্রত্যেকের কথাই মনে পড়ছিল আমার। এ নামগুলো যেন—আমার পেছনে পেছনে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাকে পিছু টানছে। প্রত্যেকের জন্যে কেমন যেন মায়া হচ্ছিল আমার।

এই যে এতগুলো নাম। এর বাইরেও কত নাম রয়েছে। কত লোক কতভাবে সহায়তা করেছেন—তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর সময়-সুযোগ পেলাম না আমি। আমার শেষ সংবাদ জানাতে পারিনি। তা হলে কি সবই স্মৃতি হয়ে যাবে? তাদের অনেকের সাথেই হয়তো জীবনে আর কখনো দেখা হবে না। কথাগুলো যখন লিখছি তখন পর্যন্তও অনেকেই আর ধরা-ধামে নেই। দেখা সাক্ষাতের বাইরে চলে গেছেন জননেতা দেওয়ান ফরিদ গাজী। ডা. ফয়জুল হকের সঙ্গেও দেখা হয়নি আর কখনো। ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন বলে জেনেছি। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুর রহমান খান মাহতাবও পরপারে। পীর হাবিবুর রহমান, আব্দুল হামিদ, বরুন রায়রাও নেই। অবশ্যি শেষোক্ত তিন জনের সঙ্গে পরেও একাধিকবার দেখা হয়েছে। জেনে গেছেন তারা সবই। কারো কারো সঙ্গে হয় যোগাযোগ। কিন্তু কেউ কেউ আছেন আমার যোগাযোগের বাইরে। আজকে এ সুযোগে সবার প্রতি জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা। এমন কি যাদের নাম কোথাও উল্লেখিত হয়নি—তাদের প্রতিও।

তাজুল মোহাম্মদ—গবেষণা ও গ্রন্থাবলী

তাজুল মোহাম্মদের জন্ম মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানায়। ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর যুক্ত হন পত্র-পত্রিকার সঙ্গেও। ১৯৮০ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা শুরু। '৮৪ থেকে নিয়মিত প্রদর্শিত হতে থাকে তা জাতীয় পত্রিকায়। স্বাধীনতা বিরোধীদের হুমকির মুখে দেশত্যাগ করেন ১৯৯৫ সালে। বর্তমানে কানাডায় বসবাসরত।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

সিলেটে গণহত্যা-১৯৮৯; দ্বিতীয় মুদ্রণ—২০০৫
সোনা মিয়া এক তরুণের প্রতিকৃতি—১৯৯০
সোনার মলাট—১৯৯০
সিলেটের যুদ্ধকথা—১৯৯৩; দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৯৯
ভাষা আন্দোলনে সিলেট—১৯৯৪
সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন—১৯৯৫
সিলেটের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মারক—১৯৯৭
একাত্তরের স্মৃতিগুচ্ছ-১৯৯৮; দ্বিতীয় মুদ্রণ—২০০৬
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে—২০০১
মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ—২০০১
মুক্তিযুদ্ধের গাথা—২০০৩
হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধ—২০০৪
যুদ্ধ দিনের কড়চা—২০০৫
আপন স্মৃতির ভুবনে জননেতা আব্দুল হামিদ—২০০৬
মার্চ '৭১—২০০৭
কানাডার চিঠি—২০০৭
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে-কুড়িগ্রাম—২০০৮
জোবায়দা খাতুন চৌধুরী -সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য—২০০৮
শিমুল ফোঁটার ১৬ দিন—২০০৮
মুক্তিযুদ্ধের পূণ্য স্মৃতি—২০০৮

মৃত্যুহীন প্রাণ আজির উদ্দিন খান—২০০৮
আমাদরে একাত্তর—২০০৮
সংগ্রামী সাত নারী—২০০৯
নানান দেশের নানান কথা—২০০৯
হেনা দাস—জীবন নিবেদিত মুক্তির প্রয়াসে—২০০৯
বারীন দত্ত ও সংগ্রামমুখর দিনগুলি—২০০৯
পৃথিবীর পথে—২০১০
আল-বদরের ডায়েরি—২০১০
গৌরবের যুদ্ধ—২০১০
একাত্তরে সিলেট : স্মৃতিকথা (যৌথ সম্পাদনা)—১৯৯৪
মৃত্যুঞ্জয়ী হিমাংশু শেখর ধর (যৌথ সম্পাদনা)—২০০৬
একজন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা মঈনুল ইসলাম চৌধুরী (যৌথ সম্পাদনা)—২০০৯

মুক্তিযুদ্ধ এবং অন্যান্য বিষয়ে কুড়িজনেরও অধিক বিদগ্ধজনের সম্পাদনা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাজুল মোহাম্মদের আর্টিকেল। ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত একটি স্কুল বুকে (India fights colonializm) ও স্থান পেয়েছে তার লেখা একটি গ্রন্থের অংশবিশেষ। যুদ্ধাপরাধীদের উপর নির্মিত বি.বি.সি. চ্যানেল ফোরের প্রামাণ্য চিত্র দ্যা ওয়্যার ক্রাইমস্ ফাইলের গবেষণা কাজ করেছেন তিনি।

তাজুল মোহাম্মদ প্রবাসে থেকেও চালিয়ে যাচ্ছেন গবেষণা এবং প্রতি বছরই প্রকাশিত হচ্ছে তার গ্রন্থ।